ছায়াপথ

* *

প্রবোধ সরকার

স্টুডেন্টস্ বুক সাপ্লাই
১৫, কলেজ স্কোয়ার : কলিকাতা

পিতৃদেবের

শ্রীচর

একমাত্র পরিবেশক :
ষ্টুডেণ্টস্ বুক সাপ্লাই
১৫ নং কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা—১২

প্রকাশক—বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ
ভারতী ভবন, ২০৬ কর্ণওআলিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

মুদ্রাকর—শ্রীশশধর চক্রবর্তী
কালিকা প্রেস লিঃ
২৫ ডি, এল, রায় ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দাম দু' টাকা

ছায়াপথ

*   *

প্রবোধ সরকার

স্টুডেন্টস্ বুক সাপ্লাই
১৫, কলেজ স্কোয়ার : কলিকাতা

পিতৃদেবের

শ্রীচর

একমাত্র পরিবেশক :

ষ্টুডেণ্টস্ বুক সাপ্লাই

১৫ নং কলেজ স্কোয়ার

কলিকাতা—১২

প্রকাশক—বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

ভারতী ভবন, ২০৬ কর্ণওআলিস ষ্ট্রীট

কলিকাতা-৬

মুদ্রাকর—শ্রীশশধর চক্রবর্তী

কালিকা প্রেস লিঃ

২৫ ডি, এল, রায় ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দাম দু' টাকা

ছায়াপথ

"ইংরাজ ভারত ত্যাগ কর!" শীর্ষক প্রবন্ধ লেখার ফলে ইংরাজ ভারত ত্যাগ করুক বা নাই করুক, জরিফকে কিন্তু তার গোয়াবাগানের বহু পুরাতন, বহু পরিচিত মেসটি ছেড়ে ইংরাজের অতিথিশালায় বছর তিনেকের জন্য আশ্রয় নিতে বাধ্য হ'তে হয়েছিল।

জেল থেকে বেরিয়ে জরিফ দেখলে, দেশের অবস্থা যথা পূর্ব্বং তথা পরম্, ইংরাজ তার আশ্রয় ত্যাগ করেনি, মাঝখান থেকে সে-ই এখন আশ্রয়চ্যুত।

জরিফ কবি—জরিফ সাহিত্যিক, পড়াশোনাও তার প্রচুর। নৈরাশ্য তার অন্তরকে স্পর্শ করলে না। অন্তরে জেগে উঠলো বিশ্বকবির সে-ই দুটি অমর লাইন, লাইন দুটি জরিফের বড়ই প্রিয়—

দুখের বেশে এসেছো বলে
তোমারে নাহি ডরিব হে।
যেখানে ব্যথা সেখানে তোমায়
নিবিড় করে ধরিব হে।

সিগারেট খাওয়া জরিফের অভ্যাস। সে অভ্যাস আজও যায়নি। জেলের কড়া নিয়ম-কানুনের মাঝেও তার নেশার খোরাক ঠিক জুটে গেছে, এক আধ বছর নয় পুরো তিনটি বছর নেশার ব্যতিক্রম কোনদিন হয়নি। সাহিত্যিক হিসাবে অনেকেই তাকে খাতির করতো, ভালবাসতো, শ্রদ্ধার মর্য্যাদা সে বাইরের চেয়ে ভেতরেই পেয়েছে বেশী

জরিফের সাধারণ অভাব-অভিযোগকে জেলের বাসিন্দা... নিজেদের অভাব, অভিযোগ বলেই মনে করতো এবং সাধ্যানুসা... চেষ্টা করতো সেই অভাব-অভিযোগের প্রতিবিধান করতে।

বাইরের আলো, বাতাসের সংস্পর্শে এসে জরিফ তার ছেড়ে-আসা বন্ধুদের অভাব এই প্রথম বোধ করলে।

ভিক্ষায় যারা অভ্যস্ত হাত পাততে তাদের বাধে না, নেশার অভাবে দম ফেটে গেলেও জরিফ কি পারে পথ চলতি লোকের কাছে হাত পেতে সিগারেট আদায় করতে! ... লোককে সিগারেট খেতে দেখে জরিফের নেশা করার বাসনাটা যে ...মশঃই উগ্র হ'য়ে উঠলো। দস্তুরমত কষ্ট হচ্ছিল তার। নেশার ...বে নেশাখোরের যে কি মর্ম্মান্তিক কষ্ট হয় তা যেন জীবনে আজ এই প্রথম বুঝলে জরিফ।

একরকম উদ্দেশ্য বিহীনের মতই এলোমেলো ভাবে পথ ...য়ে চলেছে জরিফ। কোথায় যাবে, কি খাবে, কোথায় থাকবে—কিছুই ঠিক নেই। মাঝে মাঝে গোয়াবাগানের মেসের স্মৃতি তার ম... উদারে উঁকি দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সেখানে গিয়ে ওঠবার মুখও যে ... নেই। খাওয়া ও থাকা বাবদ মেসের ম্যানেজার আজও তার ...হু তিন মাসের টাকা পাবে। জেল-ফেরতা কপর্দ্দক শূন্য জরিফকে দেখে নিশ্চয়ই তিনি সাদর অভ্যর্থনা জানাবেন না!

জরিফ—!

জরিফের পাশ দিয়ে একখানা ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে মোটার ফুল্‌-স্পীডে গিয়ে অদূরে সশব্দে ব্রেক করলে। মোটারের উড়ন্ত ধূলো ...ড়িয়ে পড়লো জরিফের মুখে, চোখে, সর্ব্বাঙ্গে। জরিফ মন্থরগতিতে যেমন চলছিল তেমনই চলতে লাগলো। মোটারের 'ডাক' তার কানে পৌঁছয়নি, পৌঁছলেও সে খেয়াল করেনি। কেমন করেই বা খেয়াল

করবে, মোটার-চড়া বন্ধু তার আছেই বা ক'জন! সেদিক দিয়ে বিচার করলে জরিফের ঔদাসীন্যের ওপর দোষারোপ করা যায় না।

স্যুটধারী এক তরুণ পিছুন থেকে এসে জরিফের পথ রোধ করে দাঁড়াল। ক্ষণেকের জন্য স্তম্ভিত হ'য়ে গেল জরিফ, ভাবলে—পথ চলতে গিয়ে হঠাৎ সে বুঝি কারো কোন অপরাধ করে ফেলেছে।

—হাঁ ক'রে চেয়ে দেখছো কি, আমাকে চিনতে পাচ্ছো না?

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আগন্তুকের মুখের দিকে চেয়ে জরিফ বললে, চিনতে তো পাচ্ছি, কিন্তু—

—কিন্তু এই যে হঠাৎ আঙুল ফুলে কলাগাছ হলো কেমন করে? এসো—গাড়ীতে বসে বসে কথা বলি, এখানে এ অবস্থায় রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাতমুখ নেড়ে কথা বলতে দেখলে লোকে ভাববে আমি মহাজন আর তুমি খাতক! আগন্তুক একরকম জোর করেই টানতে টানতে জরিফকে তার গাড়ীতে নিয়ে গিয়ে তুললে। তুই আর তুমি—দুটো শব্দই এদের মধ্যে সমান ভাবে চলে।

—আগে একটা সিগারেট দে, পেট আমার ফুলে গেল মহিম। আগ্রহান্বিত কণ্ঠে বললে জরিফ।

সিগারেটে পর পর গোটা পাঁচ-সাত টান দিয়ে জরিফ বললে, প্রায় ভোর বেলা জেল থেকে বেরিয়েছি—এ পর্য্যন্ত একটাও সিগারেট খাইনি। তারপর?

—তুই তো জেলে গেলি, একরকম খাওয়া থাকার হাত থেকে পেলি নিষ্কৃতি। সেদিক থেকে সরকার বাহাদুর তোর উপকারই করেছে বলতে হবে। যাই হোক তুই তো বেঁচে গেলি। আমার অবস্থা হ'য়ে উঠলো—যাকে বলে, "বল মা তারা দাঁড়াই কোথা।"

বেশী বকা চিরকালই মহিমের একটা অভ্যাস। ধৈর্য্যবান্ শ্রোতা বা বদ্ধকালা নইলে তাকে সব সময় সহ্য করা শক্ত। ধৈর্য্যচ্যুতি

—একি, গোয়াবাগানের দিকে কোথা চলেছিস? অস্বস্তি বোধ করে জরিফ।

মুখ না ফিরিয়ে মহিম হাসি মুখে বললে, কেন—ভয় হচ্ছে?

—ভয় নয়, চক্ষু লজ্জা!

আমি তো জানতাম কবি, সাহিত্যিকদের ও-জিনিষটার বালাই নেই।

আগে ছিল না, এখন হ'য়েছে।

রসিকতা করে মহিম বললে, তাহলে কবি, এ তোমার উত্থান—না পতন!

না, না ঠাট্টা নয় মহিম। ওখানে আমি আপাততঃ গিয়ে উঠবো না। তার চেয়ে আমায় গাড়ী থেকে নামিয়ে দে, থাকা-খাওয়ার স্থান ঠিক একটা জুটিয়ে নেবোখন।

জরিফের কথার ওপর মোটেই সে গুরুত্ব আরোপ করলে না, নিজের মনে হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলো।

মোটার থেকে লাফিয়ে পড়া সম্ভব হ'লে জরিফ তাও করতো, একি জুলুম মহিমের! জেনে শুনে সে তাকে অপমান করতে নিয়ে যাচ্ছে।

কোন রকমেই মহিমকে নিবৃত্ত করা গেল না। সে তাকে গোয়াবাগানের মেসে এনেই তুললো। মহিম মোটার থেকে নামা মাত্র হন্ত-দন্ত হ'য়ে ছুটে এলো সেই পুরাতন 'হোঁদল-কুত্‌কুতের' মতো আধা-বুড়ো ম্যানেজার। মহিমের খাতির দেখে দস্তুরমত বিস্মিত হলো জরিফ। কিন্তু এ বিস্ময়ের ভাবটা তার এক লহমাতেই কেটে গেল। আগেকার মহিম আর আজকের মহিম—আকাশ পাতাল তফাৎ। বড়লোক মহিমকে আজ যে ম্যানেজার খাতির করবে—এ আর এমন বড় কথা কি! কিন্তু তাকে তো খাতির করার কথা নয়,

তিন-তিনমাসের টাকা বাকি! তবে কি এ খাতির মহিমের সাহচর্য্যের ফল? সত্য সত্যই জরিফ হক্‌চকিয়ে গেল!

খাওয়ার কষ্ট জরিফের সহ্য হয় কিন্তু থাকার কষ্ট বা অসুবিধা সে কোনদিনই সহ্য করতে পারে না। একখানি ঘরে একা থাকতে না পারলে সে দস্তুরমত অশ্বস্তি বোধ করে। শুধু মহিম আর ম্যানেজার কেন—তার বন্ধুবান্ধবের মধ্যে অনেকেই এ খবরটা জানে।

তিন তলার একটি একানে ঘরে জরিফকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে মহিম 'কোন চিন্তা নেই, সব ঠিক আছে' বলে চলে গেল।

মেসের পুরাতন বন্ধুগণ এসে জরিফকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে গেল। সবই হলো ভালো কিন্তু জরিফের জড়তা কাটলো না, সদাই মনে একটা 'কিন্তু' ভাব। ম্যানেজারের রুদ্র মূর্ত্তি প্রতি মুহূর্ত্তেই সে চর্ম্ম চক্ষে দেখার জন্য যেন উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলো।

পর্ব্বতের মূষিক প্রসবের মত ব্যাপারটা যে এতোখানি হালকা তা মোটেই কল্পনা করতে পারেনি জরিফ। মানুষের প্রতিহিংসা যে কতখানি ভদ্রভাবে নেওয়া যায় তা মহিম বেশ ভাল ভাবেই দেখিয়েছে।

টাকা হাতে পেয়ে সবার আগে কিনেছে সে এই মেসের দু'স্তবক বাড়ী। আর বাড়ীর মালিক হ'য়ে সে নিজে সঙ্গে সঙ্গে হ'য়েছে মেসেরও মালিক। নতুন ম্যানেজার না রেখে সেই সাবেকী আমলের পুরাতন ম্যানেজারকেই সে বহাল করেছে কাজে। এই ম্যানেজারই একদিন না জানিয়ে তার 'মিল' বন্ধ করে দিয়েছিল, দুপুরবেলা খেতে গিয়ে অভুক্ত অবস্থায় শুকনো মুখে মহিমকে রাস্তায় বেরিয়ে এসে কলের জল খেয়ে দিন কাটাতে হ'য়েছিল। হ্যাঁ—এরই নাম প্রতিহিংসা! জরিফ মনে মনে বন্ধুর বুদ্ধির তারিফ করে।

বাড়ীখানার দু'স্তবকে দুটি মেস—একটি হিন্দুর আর অপরটি মুসলমানের, ম্যানেজার কিন্তু একজন।

এখানে ঘরে নির্ভাবনায় জরিফের দিন একরকম মন্দ কা ছিল না। 'কোন চিন্তা নেই, সব ঠিক আছে'—মহিমের কথার পর্য্য মর্ম্মে মর্ম্মেই বোঝে জরিফ।

কিন্তু বন্ধুর কাঁধের ওপর এভাবে আর কতদিন কাটানো যায়, চক্ষুলজ্জায় যেন বাধে। হ'তে পারে মহিম বড়লোক কিন্তু তাই বলে জরিফ কি তার ওপরে দিনের পর দিন এইভাবে অবাঞ্ছনীয় সুবিধা গ্রহণ করবে! নাঃ একটা কিছু নিশ্চয়ই করবে জরিফ, অন্ততঃ মেস খরচাটা যে কোন উপায়ে তাকে সংগ্রহ করতে হবে।

চাকরী—! নাঃ চাকরী করা জরিফের ধাতে সই। বাঁধা ধরা নিয়মে কাজ করা, সময়ের মাপকাঠি অনুসারে পা মেপে চলা ওর ধাতে সইবে না। চাকর হবার মনোবৃত্তি নিয়ে সে নি। সঙ্গে সঙ্গে একথাও সত্যি যে মনিব হ'য়ে হুকুমনামা জারী বার দাম্ভিকতাও তার নেই। তবে—? চিন্তার কি আছে! সে স্রষ্টা, সৃষ্টিতেই তার আনন্দ—, নিজের সৃষ্টি দিয়ে সে বেঁচে থাকবে; কন সে বন্ধুত্বের দোহাই দিয়ে হ'তে যাবে অন্যের গলগ্রহ!

জরিফ দিস্তে কয়েক কাগজ কিনে নিয়ে এলো। আর য়ে এলো এক কৌটা সিগারেট এবং পয়সা কয়েকের নস্য (এ চার হিসাবে মাথা সাফ করার জন্য মাঝে মাঝে দরকার হতে পারে)।

দরজা বন্ধ করে লিখতে বসলো জরিফ। এবার আর রাজনীতির কচ্‌কচি নয়, জেলের অভিজ্ঞতা নিয়ে একখানি প্রেমের উপন্যাস। বিরহ-মিলন কথা পরিস্ফুট হ'য়ে উঠবে তার উপন্যাসের প্রতিটি ছত্রে। জেলের এক প্রেমোন্মাদ তরুণই হলো তার উপন্যাসের নায়ক। বাস্তব জগতের ঐ কারাগৃহবাসী তরুণের প্রেমিকাই যে হবে তার উপন্যাসের নায়িকা—একথা তো ধ্রুব সত্য।

বাস্তবতার ওপর কল্পনার রঙ্‌ ফলিয়ে লিখে চলেছে জরিফ।

নিজের মনকে নিয়ে খেলা করার অবসর বহু দিন তার হয়নি। সিগারেট ধরাবার অবসর পায় না জরিফ, কলম তার থামতে চায় না, কথার উৎস যেন কলমের ডগায় জুগিয়েই আছে। পাতার পর পাতা সে অক্লান্তভাবে লিখেই চলেছে। আত্মতৃপ্তির ছায়া জরিফের চোখে, মুখে, সর্ব্বাঙ্গে।

হঠাৎ কলমটা করে বসলো বেইমানী, সঙ্গে সঙ্গে জরিফের মনটা গেল বিষম বিষিয়ে! এমন কি সে লিখলে যাতে এরি মধ্যে তার কলমের কালি ফুরিয়ে গেল! দোষ কার—কলমের, না কালির? কালি কলমের কাছে বেকুব ব'নে গেল জরিফ।

কলমটা দু'চার বার সজোরে ঝাড়লে কিন্তু কলমের ডগায় কালি এলো না। জরিফের কল্পনার উৎস অফুরন্ত হ'তে পারে কিন্তু কালির উৎস তো আর অফুরন্ত নয়। বিরক্তি ভরে কলমটা রেখে জরিফ মুখ তুলে চাইলে।

একান্ত আকস্মিক ভাবে হলো চোখোচোখি—চারি চোখে মিলন। সামনের বাড়ীর জানালায় কে জানে কতক্ষণ ধরে ঐ মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে।

মাত্র ঐ এক লহমা—জরিফের চোখ আপনি নেমে এলো। মেয়ে-ছেলের চোখের ওপর চোখ রেখে তাকিয়ে থাকতে জরিফের রুচিতে বাধলো। একটা সিগারেট ধরালে জরিফ। অন্যদিকে চেয়ে কতক্ষণ আর সিগারেট খাবার ভান করা যায়, চোখ তাকে ফেরাতেই হলো। কি সর্ব্বনাশ! তরুণীটি যে এখনো তার দিকে পলকবিহীন নেত্রে চেয়ে।

অভ্যস্ত না হওয়ায় তরুণীটির চোখের ওপর চোখ রেখে এবারেও আর বেশীক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারলে না জরিফ। মুখ নামিয়ে সে সিগারেট ফেলে নস্য নেবার ভান করলে।

নস্য নিতে অভ্যস্ত নয় জরিফ, হাঁচি আসা তার পক্ষে মোটেই অস্বাভাবিক নয়। হাঁচতে গিয়ে মুখ তাকে তুলতেই হলো। হাঁচির প্রত্যুত্তরে মেয়েটি ফিক্ করে মৃদু একটু হাসলো।

তরুণীর হাসি দেখে ভয় হলো জরিফের। কি সাঙ্ঘাতিক মেয়েরে বাবা! ব্যাটাছেলের চোখে চোখ পড়লে কোথা সলজ্জভাবে চোখ নামিয়ে নিয়ে ছুটে পালাবে—তা নয়, ফিক্ করে হাসি! ভয়ানক ঘাবড়ে গেল জরিফ। কিন্তু এতো বড় মুস্কিলের কথা, ব্যাটাছেলে হয়ে সে করবে ঐ তরুণীর ভয়ে অথবা লজ্জায় স্থানত্যাগ! জরিফের বুকটা দুর দুর করে উঠলো, ঠোঁট দুটো যেন শুকনো বোধ হলো, কপালে ফুটলো ঘাম।

সাহস সঞ্চয় করে জরিফ আর একটা সিগারেট ধরালো। কি আশ্চর্য্য, তরুণীটি এখনো দাঁড়িয়ে ঐ জানলার গরাদ ধরে! মেয়েটির চোখের ওপর চোখ রেখে সিগারেটটা ঠোঁটের কাছে ধরে মৃদু কাষ্ঠ হাসি হাসলে জরিফ। মেয়েটিও মৃদু, স্নিগ্ধ হাসি দিয়ে দিলে তার হাসির প্রত্যুত্তর!

জরিফের সৃষ্টির কল্পনা কখন যে মুছে গেল মন থেকে তা সে টেরই পেলে না। বন্ধ দরজার দিকে একবার চেয়ে সে চেয়ারখানা যথাসম্ভব জানলার ধারে এগিয়ে নিয়ে এলো। মেয়েটা ফিক্ করে হেসে সরে গেল জানলার ধার থেকে। নিজের মনে নিজেই লজ্জিত হলো জরিফ, ছিঃ মেয়েটা কি বেকুবই তাকে বানিয়ে গেল। হ্যাঁ—খেলোয়াড় বটে!

তরুণীর ফিরে আসার প্রতীক্ষায় জরিফ বসে রইলো—গালে হাত দিয়েই বসে রইলো। ডাক ছেড়ে কেঁদে কেঁদে গাইতে ইচ্ছা হলো জরিফের—সে যে 'জ্বালিয়ে আগুন পালিয়ে গেল, নিভিয়ে গেল না!'

বৃথা আশা, সে এলো না—ফিরে আসার কোন সম্ভাবনাও দেখা গেল না। আশাহত জরিফ ক্ষুণ্ণ মনে ঘরের খিল খুলে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

তখন অপরাহ্ন পেরিয়ে গোধূলির আলো ছায়া নেমে এসেছে ধরণীর বুকে। পাশের ঘরে আড্ডা বসেছে। ক্ষুণ্ণ মনটাকে স্নিগ্ধ করে নিতে আড্ডাঘরে গিয়ে ঢুকলো জরিফ।

—এসো—এসো কবি এসো! হোক রসিকতা তবু কবিজনোচিত সম্বর্দ্ধনার ছোঁয়াচ আছে ওদের কথার স্থরে।

তারপর, দুপুর থেকে ঘরে দরজা দিয়ে কি মানস-প্রতিমার ধ্যান কচ্ছিলে? বললে জাহাঙ্গীর।

—না, লিখছিলাম! পকেটে টাকা না থাকলে, প্রেমই বল আর প্রতীমাই বল, কিছুই কিছু নয়। কেমন—তাই না করিম?

প্রেম সম্বন্ধে করিম পি-আর-এস। অভিজ্ঞতা তার প্রচুর। স্কুল, কলেজ, কর্ম্মজীবন—কোন জীবনেই সে অনভিজ্ঞ ছিল না। প্রেম-শাস্ত্রটা সে ছেলেবেলা থেকেই আয়ত্ত করে আসছে। কাজেই তার মন্তব্যের নিশ্চয়ই একটা দাম আছে বিশেষতঃ তার বন্ধু মহলে।

করিম মুখ খুললে। সজোরে এক টিপ নস্য নাকের মধ্যে গুজে দিয়ে পরিহিত লুঙির প্রান্তদেশে নাকটা মুছে নিয়ে বলতে স্থরু করলে করিম। প্রেমই বল—আর ভালবাসাই বল—স্রেফ ভুয়ো, ধাপ্পাবাজি! কি পুরুষ, কি মেয়ে—সবাই স্থবিধাবাদী। তবে হ্যাঁ—'চোখের নেশা' কথাটার দাম আছে। চোখের নেশা আর প্রেম যে এক জিনিষ নয়—এটাই আমরা বুঝতে ভুল করি। ভারত সম্রাট জাহাঙ্গীর নূরজাহানকে বুকে পাবার জন্যে কি না করেছিল, কিন্তু আমি হলফ্ করে বলতে পারি—বড় জোর তিন বছরের বেশী তাকে ভাল লাগেনি। প্রথম বছর—'চোখে চোখে রাখি হায়রে', দ্বিতীয় বছর—'সে যে আকাশের

—চাঁদ, আকাশের তারা', আর তৃতীয় বছর—'তুমি যবে রহিবে দূরে'! অর্থাৎ তিলে তিলে তিনটি বছরে নূরজাহান নিঃশেষ হয়ে গেল, জাহাঙ্গীর হলো নিশ্চিন্ত!

উত্তর দিলে জাহাঙ্গীর বিড়ি টানতে টানতে, কিন্তু ভুলো না দোস্ত, জাহাঙ্গীর ব্যাটাছেলে। ব্যাটাছেলে বেইমান হ'তে পারে, কিন্তু—

—কিন্তু ছেলেমেয়ে নয়, এই তো? বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে যেমন বসে আছো ঠিক তেমনি বসে থাকো, যা জানো না সে সম্বন্ধে একটাও বাজে কথা বলবার চেষ্টা করো না। বলে বিজ্ঞের হাসি হাসলে করিম।

নির্ব্বিকার চিত্তে জাহাঙ্গীর আর একটা বিড়ি ধরালে।

করিম সিগারেটে একটা জোর টান দিয়ে বললে, নামটাই শুধু জাহাঙ্গীর, আজ অবধি জীবনে প্রেম তো কোনদিন করলে না। ব্যাটাছেলে বেইমানী করে—স্বীকার করলাম, কিন্তু মেয়েছেলে মাঝে মাঝে এমন জঘন্য দাগাই দেয় যে ক্ষত সারা জীবনে শুকায় না। তা ছাড়া—রুচি। ওদের রুচি বড় নিম্নগামী।

আর থাকতে পারলে না জাহাঙ্গীর। বললে রাখো না! মেসের ছুঁড়ি ঝিয়ের সঙ্গেই কত রুচিবাগীশ লটকে যাচ্ছে—তার আবার ফিরিস্তি আছে!

করিম তখন গরম হ'য়ে উঠেছে। সে চেঁচিয়ে উঠলো, পুরুষ বেইমান হ'তে পারে, সাময়িকভাবে রুচি তাদের নিম্নস্তরের হ'তে পারে কিন্তু তারা নিমক-হারাম নয়। মেয়েদের মুখে মৃদু হাসি, বুকে লুকানো মিছরির ছুরি। কিন্তু ওঁদের বয়কট করলে আমাদের চলবে না। ওদের সঙ্গে হাসবে, কথা বলবে, প্রাণখুলে মিশে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠবে। এই সিগারেটেরই মত ওরা আমাদের প্রিয়—ভালবাসার উপাদান। কিন্তু কতক্ষণ—? যতক্ষণ না ওদের উপভোগ করে নিঃশেষ করে

ফেলতে পারো। তারপর—? তারপর এই নিঃশেষিত সিগারেট টুকরোটারই মত এমনি করে ছুড়ে দূরে ফেলে দেবে!

একটা সুখটান দিয়ে কথা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে করিম সিগারেটের টুকরোটা ঘৃণাভরে দূরে ছুড়ে ফেলে দিলে।

করিমের এই সাফল্যমণ্ডিত অভিনয়ে এক জরিফ ছাড়া আর সকলেই উপভোগের হাসি হাসলে!

পরের দিন ঘুম থেকে উঠতে জরিফের একটু দেরীই হলো। কারণটা খুবই স্বাভাবিক, রাতের প্রথমাংশ তার কেটেছে হঠাৎ দেখা-হওয়া ঐ তরুণীর চিন্তায়। বিছানায় বসে মাথার দিকের জানালাটা খুলে দিলে জরিফ, তারই ঘরের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে সদ্য-ঘুমভাঙা সেই তরুণী।

জরিফের সঙ্গে চোখোচোখি হ'তেই মেয়েটি দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার করলে। হাসিমুখে জরিফ করলে প্রতি নমস্কার। এইভাবে হলো দিনের সূচনা।

দুপুরে আহারাদি সেরে জরিফ স্নিগ্ধ মনে এসে ঘরে দুয়ার দিলে। প্রেমের প্রথম পরশ জেগেছে তার মনে, ডুবে যাক বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অতল পাথারে, ঘুমিয়ে পড়ুক দুনিয়ার প্রতিটি প্রাণী, জেগে থাকবো শুধু আমরা দুজনে—নিঃসঙ্গ নীরবতার মাঝে শুধু তুমি আর আমি!

বোঁটাসমেত একটি আধফোটা রক্ত গোলাপ হাতে নিয়ে এসে দাঁড়াল তরুণী এলায়িত কেশে। মরিয়া জরিফের বুকের বল, সাহসের মাত্রা আগের দিনের তুলনায় অনেকখানি বেড়ে গেছে, সে দু'হাত বাড়িয়ে হাসি মুখে ইসারায় ঐ ফুলটি চেয়ে বসলো। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলো জরিফ। তরুণী লাজনম্র স্নিগ্ধ হাস্যে ঘাড়টি এধার ওধার আন্দোলিত করে জানালে—'না'!

কৃত্রিম অভিমানে নিজের মুখের ওপর গাম্ভীর্য্যের ছায়া ফুটিয়ে

তুললে জরিফ। বিনা প্রয়োজনে সে একটা সিগারেট ধরিয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বসলো।

অভিমান আরো বেশী পরিস্ফুট করে ধরবার জন্য জরিফ একখানা মাসিক পত্রিকা টেনে যেন গভীর মনোযোগ সহকারে পড়তে সুরু করলে। পাতার পর পাতা পড়ার ভানে উল্টে চললো জরিফ, পাঠ্যবস্তুর একটা লাইন—একটা অক্ষর তার দৃষ্টি পথে এসে দাঁড়াল না।

আড় চোখে দেখলে জরিফ—মেয়েটি তারি দিকে চেয়ে দুষ্টামির চোরা হাসি হাসছে। অর্থাৎ তোমার মনের গোপন খবর আমি জানি হে বন্ধু জানি, বৃথা ছল, বৃথা অভিমান! লোক-দেখানো উপেক্ষার মধ্য দিয়ে তুমি চাও আরো নিবিড় করে আমাকে তোমার কাছে টেনে নিতে।

লজ্জিত হলো জরিফ। নাঃ গাম্ভীর্য্যটা ঠিক পরিস্ফুট হয়নি। খাতা টেনে নিয়ে লিখতে সুরু করলে সে। কিন্তু কি লিখবে আর লিখবেই বা কে? 'কালি, কলম, মন—লেখে তিন জন!' একজনের অনুপস্থিতে কোনদিন, কারোর লেখা এগোয়নি—প্রমাদ গণলে জরিফ। নিজের নামটাকেই সে লেখার ভানে মিনিটের পর মিনিট নিয়ে চললো। প্রেমের নেশায় মত্ত জরিফের গায়ের ওপর যেন লাফিয়ে এসে পড়লো তরুণীর হাতের আধ ফোটা সেই ফুল। সাগ্রহে ফুলটি তুলে নিয়ে জরিফ প্রেমের প্রথম পরশ এঁকে দিলে আধ ফোটা ঐ ফুলের মুখে। এক লহমায় মেয়েটির চোখমুখ লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠলো, মেয়েটি বিদ্যুৎগতিতে সরে গেল জানলার ধার থেকে।

জরিফের মন থেকে মুছে গেল কৃত্রিম মান, অভিমানের ছায়া। সে কি আদর! ফুলকে এমন আদর জীবনে কোন দিন সে করেনি।

লুকোচুরি খেলার মত লহমার মত মুখটি বাড়িয়ে আবার সে জানলার পাশে অদৃশ্য হলো। উৎসাহিত জরিফ লাল পেন্‌সিল দিয়ে কাগজের ওপর বড় বড় করে লিখলে, নাম কি—'

মিনিটের পর মিনিট যায়, মেয়েটি আর আসে না। লেখা কাগজখানি হাতে নিয়ে নির্নিমেষ নয়নে জানলার দিকে চেয়ে আগ্রহে বসে থাকে জরিফ।

মেয়েটি কিন্তু এলো না। ধৈর্য্যহারা জরিফ সিগারেট ধরিয়ে নিজের মাথার লম্বা লম্বা চুল একটার পর একটা ছিঁড়তে লাগলো।

ধরণীর বুকে নামলো অপরাহ্নের কালো ছায়া, সেই ছায়া ছড়িয়ে পড়লো জরিফের মুখে—হতাশার কালো ছায়া! নিষ্ফল আক্রোশে ক্ষুব্ধ জরিফের চোখ মুখ জ্বালা করতে লাগলো।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা—কতক্ষণ আর বসে থাকা যায়। আসন ছেড়ে উঠে পড়লো জরিফ। বেরোবার জন্মে গায়ে পাঞ্জাবীটা চাপিয়ে আয়নার সামনে গিয়ে চিরুণীটা তুলে নিলে। আয়নায় ভেসে উঠলো তরুণীর স্বচ্ছ হাসিভরা মুখ। হাতের চিরুণী হাতেই রইলো—জরিফ পেছন ফিরে চাইলে, জানলা দু'টির গরাদ ধরে বন্ধবিহঙ্গিনী এসে দাঁড়িয়েছে।

ইসারায় দাঁড়াতে বলে—লেখা কাগজখানা দু'হাত দিয়ে তুলে ধরলে। তরুণী ঘাড় বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে কাগজের ওপর লেখাটা পড়ে হাসলে। জরিফকে হাতের ইসারায় দাঁড়াতে বলে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। মিনিট কয়েক পরে অনুরূপ একখানি কাগজে মোটা মোটা করে কি যেন লিখে এনে জানলার ধারে কাগজ খানা উঁচু করে তুলে ধরলে। সঙ্গে সঙ্গে জরিফের দরজার কড়া নড়ে উঠলো। হাত ইসারায় মেয়েটিকে সরে যেতে বলে জরিফ নিজের লেখা কাগজখানা বিছানার তলায় ত্রস্তে লুকিয়ে ধীরে মন্থর পদে গিয়ে দরজা খুলে দিলে।

কি হে, কবি—সন্ধ্যে পর্য্যন্ত ঘরের দরজা বন্ধ করে এতো কি লেখা লিখছো! চল—সিনেমায় যাই। বললে বন্ধুবর বিজয়।

মুখের বিরক্ত ভাব যথাসম্ভব গোপন করে জরিফ বললে, কি-ন-ন্তু প্রবন্ধটা যে আজই আমার শেষ করতে হবে, গুপ্ত!

মুখফোড় বিজয় গুপ্তর মুখে কোন কথাই আটকায় না। বিজ চেঁচিয়ে উঠলো, তুমি তো বড় বেরসিক হে! আজ অবধি কারো সঙ্গে প্রেম করার সৌভাগ্য তো হলোই না, উপরন্তু দু'পাঁচ খানা প্রেমের ছবিও দেখলে না; কি ছাই পাঁশ লিখবে? বাস্তবের অভিজ্ঞতা না থাকলে কেউ কখনো বড় হতে পারে না। নাও, ঘরে চাবি দাও—সময় হয়ে এলো।

নিরুপায় জরিফকে ঘরে তালা লাগিয়ে সেদিন বায়োস্কোপেই যেতে হলো। ছবির পর্দার দিকে চেয়ে থাকাই তার সার হলো। ছবির প্রতিটি নারী-চরিত্র তার চোখের সামনে ঐ নাম-না-জানা তরুণীর বাস্তব রূপ ধরে জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠলো। ক্ষণে ক্ষণে অন্যমনস্ক হয়ে উঠতে লাগলো জরিফ। আপশোষে বুকটা তার ভরে উঠলো। রাগ হলো বিজয়ের ওপর। হতভাগার জন্যে বাতায়নবর্ত্তিনী রূপসীর নামটা জানা হলো না। আর এক লহমা দেরী করে ডাকতে পারলো না হতভাগা বিজয়টা! নিয়তি আর কাকে বলে। অনু-শোচনা জানালো জরিফের অন্তরে। মনটা উঠলো দারুণ বি[illegible]য়।

বন্ধুবরকে নীরব দেখে বিজয় গুপ্ত বললে, কিহে কবি, বলিনি আগে—তোমার ভাল লাগবে! ছবি দেখতে দেখতে যখন তোমার কথা বলতে ইচ্ছা যাবে না, ইচ্ছা সত্ত্বেও সিগারেট ধরাতে পারবে না, তখনই বুঝবে—ছবিখানা তোমার ভাল লাগছে!

সমালোচনা শুনে জরিফের হাসি এলো মুখে। সে শুধু সংক্ষেপে বললে, হুঁ—ঠিক বলেছো!

পরের দিন মেয়েটি কাগজে লিখে জানালে যে নাম তার শ্যামলী।

জরিফ-শ্যামলীর প্রাথমিক প্রেম-পর্ব্ব নিত্য নব রাগ-অনুরাগের মধ্য দিয়ে দিনের পর দিন এগিয়ে চললো।

সেদিন রবিবার।

মহিম মোটার হাঁকিয়ে ভোর না হতে হতেই আকস্মিক ভাবে এসে হাজির হলো। ঘুমন্ত জরিফকে টেনে তুলে বললে, কথা আছে! মুখ হাত জলদি ধুয়ে নে—, চা আমার ওখানে গিয়ে খাবি।

আপত্তি করবার কি-ই বা থাকতে পারে! তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে বন্ধুর সঙ্গে গিয়ে মোটারে উঠলো জরিফ। প্রতিদিনের মত আজ সকালে শ্যামলীর সঙ্গে একবার চোখের দেখা—একটু হাস্য বিনিময় হলো না, হতভাগা মহিম সে সাধে বাদ সাধলে। শ্যামলী উঠে দেখবে—জরিফের ঘর খালি। হাত তুলে নমস্কার করতে গিয়ে বেচারী ক্ষুণ্ণ মনে হাত নামিয়ে নেমে। শ্যামলীর সঙ্গে দেখা-না-হওয়ার কথাটা ওর মনে খচ্ খচ্ করে বিঁধতে লাগলো ক্ষণে ক্ষণে।

মোটার ড্রাইভ করতে করতে মহিম বললে, একটা বাড়ী কিনেছি, জরিফ।

জরিফ কোন উত্তর দিলে না। বিস্ময় প্রকাশেরই বা কি আছে। মহিম হঠাৎ বড় লোক হয়েছে, নিজের সখ বা খেয়াল মেটাতে সে যে একটা বাড়ী কিনবে—এতে বিস্ময়ের কি থাকতে পারে। মহিম যদি বলতো যে সে একটা তাজমহল গড়েছে তাহলে আশ্চর্য্য হ'তে হতো বইকি!

—এবার গৃহী হবো!

মহিমের কথায় শুধু বিস্মিত হলো না, দস্তুরমত চমকে উঠলো জরিফ। বলে কি মহিম, ভূতের মুখে রাম নাম! গৃহী হবার জন্য

গৃহের যে প্রয়োজন আছে একথা গৃহী না হ'য়েও বুঝতে বিলম্ব হলো না জরিফের, কিন্তু গৃহী হতে হ'লে তো গৃহিণীর প্রয়োজন—সে বালাই তো মহিমের নেই। তবে কি বলা নেই, কওয়া নেই—হঠাৎ মহিম বিয়ে করে বসলো!

—তার মানে? বিস্ময় বিমুগ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে জরিফ।

মহিম স্বচ্ছ স্বাভাবিক কণ্ঠে বললে, এবার সংসারী হবো জরিফ। ভবঘুরে জীবন আর ভাল লাগে না আমার। চাকর-বাকরের ওপর নিজেকে সঁপে দিয়ে দিনের দিন—দেখছিস, কি হাল হ'য়েছে আমার!

মহিমের 'হাল' তো বিশেষ খারাপ ব'লে মনে হলো না জরিফের। আগেকার তুলনায় স্বাস্থ্যের তার বিশেষ উন্নতি হ'য়েছে, মুখের লাবণ্য গেছে ফিরে।

—তোমার হাল তো ভালই মনে হচ্ছে, মহিম।

ক্ষুণ্ণ হলো মহিম। বললে, তুমি না কবি! বাহ্যিক লক্ষণ দেখে অন্তরের বিচার করলে, বন্ধু। ছন্নছাড়া জীবন ভাল নয় রে ভাল নয়।

—তারপর?

—ঠাট্টা নয়, জরিফ! একটা কথাও আমি বাড়িয়ে বলিনি। ক'দিন তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে পারিনি কেন? ভয়ানক ব্যস্ত ছিলাম নিজের ব্যক্তিগত কাজে। এই তো এসে গেছি, এখুনি পাবে সব চাক্ষুষ প্রমাণ। বলতে বলতে একটা বাড়ীর গেটে ঢোকবার আগে হর্ণ দিলে মহিম।

গেটের গুর্খা দারোয়ান বিলাতী কায়দায় সেলাম দিলে, মোটার গাঁ ভরে ভিতরে গিয়ে ঘচ্ করে সজোরে ব্রেক কসলে। গাড়ীর দরজা খুলে দেবার জন্য বেহারাটা যেন এতক্ষণ প্রস্তুত হ'য়েই দাঁড়িয়েছিল।

জরিফকে সরাসরি ওপরের ড্রইং রুমে নিয়ে গিয়ে তুললে মহিম। আধুনিক কেতায় সাজান ড্রইং রুম জরিফের কাছে নতুন নয়, কিন্তু কবি-মন তার এখানে যেন কিঞ্চিৎ নূতনত্বের আস্বাদ পেলে।

—বস জরিফ। এবার চা না খেলে আর কিছুই জমবে না। বলতে বলতে মহিম ভিতরে চলে গেল।

সারা ঘরময় আবার নতুন ক'রে চোখ বুলিয়ে দেখতে লাগলো জরিফ। আসবাবের নাই প্রাচুর্য্য—নাই আড়ম্বর! কটাই বা জিনিষ, কিন্তু ওরই মধ্যে আভাষ পাওয়া যায় সু এবং সূক্ষ্ম রুচির। ক'বছর আগে মেসের সেই অখ্যাত এবং গরীব ব'লে উপেক্ষিত মহিমের মনের গোপন কোণে যে সুরুচির ফল্গুধারা এমনিভাবে লুকিয়েছিল—এ খবর বেচারা মহিমই কি সেদিন জানতো।

একটি রূপসী ঘরে ঢুকলেন, হাতে তাঁর চায়ের ট্রে। সজাগ এবং সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠলো জরিফ। ট্রেটা টিপয়ের ওপর নামিয়ে রূপসী দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে বললে, নমস্কার!

ভাষা যোগাল না জরিফের কণ্ঠে। সে শুধু দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার করলে। নারীর আকস্মিক সান্নিধ্যে ভাবটা তার কেমন থতমত হ'য়ে উঠলো।

মহিমের অনুপস্থিতি বড়ই অস্বস্তিকর লাগছিল জরিফের। কিন্তু কোন কথা না বলে বেকুবের মত বসে থাকাও কম কষ্টকর নয়, তার ওপর উঠতে পারে 'এটিকেট' অর্থাৎ ভদ্রতার প্রশ্ন। মুস্কিলে পড়লো জরিফ।

চেষ্টা এবং কষ্ট করে বললে জরিফ, মহিম কোথা গেল?

কথাকটা এমনি ভাবে তার কণ্ঠ ফুঁড়ে বেরিয়ে এলো যে—জিজ্ঞাস্যটা তার ঐ রূপসীর উদ্দেশেও হতে পারে অথবা হাওয়ার উদ্দেশ্যে হওয়াও অসম্ভব নয়।

জিজ্ঞাস্যটা যারি উদ্দেশে হোক, উত্তর দিলে কিন্তু রূপসী। উনি এই এলেন ব'লে, জামা-কাপড় ছাড়ছেন।

—এই যে আমি এসে গেছি। কিহে কবি, মেয়েছেলে দেখে হঠাৎ এমন মুষড়ে পড়লে কেন?

মহিমের কথা জরিফের পক্ষে মর্ম্মান্তিক সত্য কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে বড়ই অপ্রিয়। এ যেন তাকে আরো বেশী করে মুষড়ে দেওয়া হলো।

রূপসীর মুখের দিকে চেয়ে মহিম বললে, তারপর—! তোমাদের সব পরিচয় হ'য়েছে?

—একি সাহেব বাড়ী যে, পরিচয় করিয়ে না দিলে মানুষ মানুষকে চিনেও চিনবে না। নিন্—চা খান।

দু' বন্ধুর দিকে দু'কাপ এগিয়ে দিয়ে নিজে এক কাপ নিয়ে একান্ত ঘরোয়া ভাবে গল্প সুরু করলে রূপসী। জরিফের জড়তা কেটে যেতে দেরী হলো না। সে-ও বেশ স্বাভাবিক ভাবে ওদের সঙ্গে গল্পে মেতে উঠলো।

কিছুক্ষণ পরে সাংসারিক কাজের দোহাই দিয়ে উঠে-গেল রূপসী। নাঃ মেয়েটির শুধু রূপই নয়—গুণও আছে। মানুষকে আপনার করে নিয়ে কাছে টানবার ক্ষমতা তার অসীম। নারীসুলভ গর্ব্ব বা দেমাক তার চাল-চলন বা কথাবার্ত্তায় বিন্দুমাত্র পরিস্ফুট হলো না। মেয়েটির ব্যবহারে মুগ্ধ হলো জরিফ।

ঈষৎ চাপা গলায় জরিফ বললে উনি তো পরিচয়ের বালাই রাখেন না, কিন্তু—

—এর মধ্যে 'কিন্তু' বলে কিছু নেই। বোঝাও এমন কিছু শক্ত নয়, উনিই আমার ঘরণী।

—বিয়ে করেছিস?

—করিনি, তবে করবো!

ক্ষণেক স্তব্ধতার পর মহিম বললে, প্রথম দিন মোটারে বসে এঁর কথা তোকে আভাসে বলেছিলুম। অমন করে নাকটা কপালে তুলো না, আগে ইতিহাসটা শোন্!

—কিন্তু সংক্ষেপে!

হাসলে মহিম। বললে, নতুন প্রেম তো নয় যে ফলাও করে প্রেমোপাখ্যান বলতে হবে। বছর কয়েক আগের কথা বলছি। ইনি কলেজে পড়তেন। ভালবাসা হয় এক সহপাঠীর সঙ্গে। ওদের দু'জনের চোখেই তখন যৌবনের রঙীন চশমা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে যা হয়, প্রেমিক-প্রেমিকা ভেসে পড়লেন অনিশ্চিতের পথে। বিয়ে নেই, নেই বাঁধনের বালাই! প্রেম তো নয়—চোখের নেশা, নেশা কাটতে আর ক'দিন লাগে? প্রেমিক প্রবর উপভোগের আশা মিটিয়ে একদিন উপে গেলেন। প্রেমিকা পড়লো বিষম বিপাকে। হাতে নেই একটা পয়সা, বুকে নেই বল, মাথা সোজা করে দাঁড়াবার নেই আত্মশক্তি। সে যে কি মুস্কিল তা অনুমান করে নিতে হয় জরিফ, ভাষা দিয়ে বোঝান যায় না!

বলতে বলতে মহিমের চোখ দুটো সত্য-সত্যই সজল হ'য়ে উঠলো। নিজেকে সংযত করতে সে একটা সিগারেট ধরালে।

জরিফ বললে, তারপর?

—তারপর এই অধম-তারণ মুস্কিল-আসানের খপ্পরে সোফিয়া বেগম আজ প্রায় আড়াই বৎসর নির্বিবাদে বান্ধবীর মতই বসবাস কচ্ছেন! সোফিয়াই হচ্ছে আমার ভাগ্যবিপর্য্যয়ের সাক্ষাৎ দেবী!

হঠাৎ যেন ভাব বিপর্য্যয় ঘটলো জরিফের। সে কি যেন মনে করতে করতে নীরবে সিগারেট টানতে লাগলো। সোফিয়া—সোফিয়া বেগম! হ্যাঁ—মনে পড়েছে, এই মেয়েটির সঙ্গে একই কলেজে পড়েছে জরিফ। এক আধ বছর নয়, জরিফ ছিল ওর চেয়ে

তিন বছরের সিনিয়র। সোফিয়াকে নিয়ে তখন সারা কলেজে একটা সাড়া পড়ে গিয়েছিল। ওর সঙ্গে অন্তরঙ্গ হ'য়ে ওঠা তো দূরের কথা পরিচিত হবার জন্য বহু ছেলেকেই লালায়িত হ'য়ে উঠতে দেখা গিয়েছিল। কিন্তু 'যাতে যার মজে মন'—, নইলে অত সোনা চাঁদ ছেলে থাকতে হতভাগা প্রদীপ দত্তর সঙ্গেই বা ও অত ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠবে কেন! তখনকার দিনে 'প্রদীপ আর সোফিয়া' 'সোফিয়া আর প্রদীপ' ছিল পাঠ্যপুস্তকেরই মত জপমালা। যেদিন ওদের নিয়ে মুখরোচক চর্চ্চা না হতো সেদিনটাই বৃথা।

হঠাৎ ওদের উধাও হওয়ায় অত বড় কলেজটা যেন দিন কয়েকের জন্য মুহ্যমান হয়ে পড়লো। ক্লাসে ক্লাসে ওদের নিয়ে মিটিং যা বসতো তাকে লোক-সভারই নামান্তর বলা যেতে পারে।

চোখ, মুখ নাক, মাথার কালো কোঁকড়ান চুলের রাশ—কিছুই বদলায়নি সোফিয়ার, বদলেছে শুধু আদলটা। দোহারা ছিপছিপে চেহারার ওপর বেশ দু'পুরু চর্ব্বি বসেছে। মোটা অবশ্য বর্ত্তমানে ওকে বলা যায় না তবে ধরণটা যেন ঐ মোটা হওয়ার দিকেই এগিয়ে চলেছে। মোট কথা সেই বহুজন মানসী প্রিয়া সোফিয়া আজ মহিমের ঘরণী।

—তুই ওকে বিয়েই কর, মহিম!

—তা অবশ্য আমি শীগগিরই করবো। তবে কি জানিস জরি—, মেয়েছেলেকে যে বিশ্বাস করে সে হ'চ্ছে 'শালা', আর যে বিশ্বাস না করে সেও হচ্ছে 'শালা'। ঠিক যদি থাকবার হয়—ওরা ঠিকই থাকবে, আর যদি বেগড়াবার প্রবৃত্তি যায় তাহলে কোন কিছুর বাঁধন দিয়েই আটকে রাখা যাবে না। আর এক কাপ ক'রে চা দিতে বলি! ব'লে বৈদ্যুতিক ঘণ্টাধ্বনি করলে মহিম।

বেহারা এসে ঢুকলো।

—দু'পেয়ালা চা।

—জী!

নাঃ আদব কায়দার দিক থেকে পুরোদস্তুর ইঙ্গ-বঙ্গ হ'য়ে উঠতে মোটেই দেরী লাগলো না মহিমের। তার ওপর আছে বেগমের সাহচর্য্য, বাদশা বলতে যতটুকু যা দেরী!

লক্ষহীরা ছিল গত কোন সে যুগের এক নামকরা উচ্চ স্তরের পতিতা। তার সম্বন্ধে কত অলৌকিক কাহিনীই না শোনা যায়। গুণী, জ্ঞানী বহু ব্যক্তি তার সান্নিধ্য লাভের জন্য নাকি ছিল লালায়িত। —তা না হ'ল, কিন্তু ঐ বহুজন বাঞ্ছিতা বীরাঙ্গনাকে যদি কেউ গৃহিণীর পদে অভিষিক্ত করে তাহলে ঐ গৃহীর উপর শ্রদ্ধা আমাদের নিশ্চয়ই বৃদ্ধি পায় না। মনটা আমাদের স্বভাবতঃই সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে, সংস্কারের কাঁটা কোথায় যেন বিঁধতে থাকে।

সোফিয়া—শিক্ষিতা, মার্জ্জিত রুচি সোফিয়া—প্রেমবিহ্বলা সোফিয়া আজ মহিমের গৃহিণীর পদ অধিকার করে বসেছে। এতে জরিফের মত তৃতীয় ব্যক্তির ক্ষুণ্ণ হবার কি-ই বা থাকতে পারে? কিছু না। তবু ঐ আধুনিকার পূর্ব্ব ইতিহাস মনে করলে সংস্কারে কোথায় যেন বাধে।

হঠাৎ মহিম বললে, তুই মেস ছেড়ে এখানে উঠে আয় জরিফ। তোর কোন কষ্ট হবে না। লেখার, পড়াশোনার পাবি প্রচুর অবসর।

মেস ছাড়ার নামে আঁতকে উঠলো জরিফ। মেস ছাড়া মানেই শ্যামলীকে হারান। সর্ব্বনাশ! মহিম কি কিছু টের পেয়েছে নাকি!

—না—না, ওখানে আমি বেশ আছি। পড়াশোনার দিক দিয়েই বল আর লেখার দিক দিয়েই বল, কোন দিক দিয়ে কোন অসুবিধা নেই।

—তুই বুঝতে পাচ্ছিস না জরিফ, সারাদিন আমাকে প্রায় বাইরে থাকতে হয়—বড্ড একঘেয়ে লাগে বেচারী সোফিয়ার। কখনো ব লিখলি, কখনো বা গল্প করলি, দিন তোর এখানে ভালই কাটবে।

রসিকতা করে জরিফ বললে, শেষকালে যদি বেহাত হ'য়ে যায় সোফিয়া ?

দিল খোলা হাসি হাসলে মহিম। বললে, প্রথম প্রথম বে কিছুদিন কষ্টই হবে, সামলাতে একটু সময় লাগবে। তারপর যদি প্রয়োজন হয় একান্ত—'এক রাণী যাবে, অন্য রাণী হবে। হৃদয়ের সিংহাসন কভু খালি নাহি রবে।'

—হয়তো আমি এখানেই আসতাম কিন্তু ওখানে কেমন আমার একটা মায়া পড়ে গেছে। মনে হয়—ঐ মেসের দেয়ালের প্রতি ইটখানাকে পর্য্যন্ত আমি ভালবেসে ফেলেছি। ওখানে না থাকলে লেখা আমার খুলবে না মহিম! জরিফের গলাটা শেষের দিকে যেন ধরে এলো।

—ওরকম হয়। থাকতে থাকতে মায়া অমন পড়ে। ও কিছু না, মনের দুর্ব্বলতা। বিশেষতঃ কবিরা একটু ভাবপ্রবণ কিনা! এখানে এলে দেখবি—সোফিয়া তোর মনকে দু'দিনেই চাঙ্গা করে তুলবে। আর দ্বিমত করিসনি, চট্‌পট চলে আয়।

—তা হয় না, মহিম! এখানের আবহাওয়া আমি বরদাস্ত করতে পারবো না। আর—আর কিছু মনে করিসনি, তোর সোফিয়াকে আমি ঠিক সহ্য করতে পারবো বলে মনে হয় না।

গুম খেয়ে গেল মহিম। সোফিয়া সম্বন্ধে এতখানি আঘাত জরিফ যে কোনদিন তাকে দিতে পারে—একথা সে কল্পনাও করতে পারেনি। কল্পনার অতীত হয়ে আঘাত যখন সত্যিই এলো তখন তাকে বুক পেতে সহ্য করাই হচ্ছে বুদ্ধিমানের কাজ। মহিম নিজের

দুর্বলতা ধরা দিলে না। সাময়িক ভাবে সে অবস্থাটা মানিয়ে নিলে। গল্প আর তেমন জমলো না। জরিফকে খেয়ে যাবার কথা বলতে মুখে তার কেমন বাধলো, ভয় হলো। দিনদুপুরে অভুক্ত অবস্থায় জরিফকে বিদায় দিলে।

সোফিয়াকে কিছুই বলে দিতে হয়নি। সে জরিফের খাওয়ার আয়োজন করেছিল! না খেয়ে চলে যাওয়ায় সে ক্ষুণ্ণ হলো। বললে মহিমকে, তুমি যেতে দিলে কেন?

সোফিয়ার পক্ষে এ ধরণের প্রশ্ন করা যতখানি সোজা—মহিমের পক্ষে উত্তর দেওয়া ততখানিই কঠিন। দেঁতো-হাসি হেসে মহিম বললে, ও বড্ড লাজুক! বিশেষতঃ খাওয়ার ব্যাপারে মেয়েদেরও ও হার মানিয়ে দেয়। তা ছাড়া মেসে তো ব'লে আসেনি, এখানে খেলে অনর্থক মিলটা ওর নষ্ট হবে। যাকগে, জরিফ তো শুধু বন্ধু নয়, ও আমাদের ঘরের লোক। আর একদিন খাইয়ে দিলেই হবে।

রাত প্রায় দুটো।

প্রেমের উপন্যাস পাতার পর পাতা লিখে চলেছে জরিফ। সারাদিন আজ শ্যামলীর সঙ্গে দেখা হয়নি, মেজাজটা ঠিক প্রেমের উপন্যাস লেখার মত নয়, তবু জরিফ লিখে চলেছে,—জেদের বশে কলম যেন তার ছুটে চলেছে। তার চিন্তার ধারাই রূপ পাচ্ছে উপন্যাসের পাতায়। উপন্যাসের নায়িকা অর্থাৎ ঐ শ্যামলীকেই ধরা যাক। সকালে সোফিয়ার সম্বন্ধে সে ঘৃণাসূচক, সমালোচনামূলক মন্তব্য করে এসেছে মহিমের বাড়ীতে বসে। কে বলতে পারে—ঐ শ্যামলীই সোফিয়ার দ্বিতীয় সংস্করণ নয়! হয়তো ঐ নব পরিচিতা মেয়েটার পেশাই হচ্ছে প্রেম করা। সোফিয়ার পা একবার পিছলেছে কিন্তু শ্যামলীর পা যে কতবার পিছলেছে তাই বা কে

বলতে পারে! ছিঃ ও-ভাবে মহিমের মনে ব্যথা দেওয়া তার ঠিক হয়নি। নিজের বুকে হাত দিয়ে কথা বলতে না জানার ঐ হচ্ছে দোষ!

কলম কামড়াতে কামড়াতে নিজেকে নিজে সান্ত্বনা দেয় জরিফ। কিন্তু আঘাত না করেই বা উপায় কি, জরিফকে মেস ছাড়া করতে ও যে একবারে নাছোড়বান্দা হয়ে উঠলো। মেস ছাড়া জরিফের পক্ষে বর্ত্তমানে যে কতখানি মর্ম্মান্তিক তা যদি মহিম বুঝতো!

—ও মশাই শুনছেন! আর কখন ঘুমোবেন, কাক-কোকিল ডাকবার যে সময় হয়ে এলো।

চমকে উঠে পিছন ফিরে চাইলে, শ্যামলী তার জানলায় দাঁড়িয়ে কথা বলছে। চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে তার সর্ব্বাঙ্গে।

টেবিল ছেড়ে জানলার ধারে এগিয়ে এলো জরিফ। বললে, আপনি এখনো শুতে যাননি?

—অত জোরে নয়, চাপা গলায় কথা বলুন। আমি কালা নই, শুনতে পাই। শুতে যাইনি কেন? আপনাকে না শুতে পাঠিয়ে যাই কেমন করে?

—জানলার ধারে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন?

—তা ঘণ্টা দেড়েক হবে। একখানা বই পড়ছিলাম। পড়তে পড়তে কি খেয়াল গেল, উঠে এলাম। দেখি—আপনি মাথা গুঁজে লিখেই চলেছেন। ধ্যান পাছে ভেঙে যায় তাই ঠায় চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। ঢঙ্ ঢঙ্ করে ঘড়িতে দুটো বাজলো। আর না ডেকে থাকতে পারলুম না। আজ সারাদিন ছিলেন কোথা?

—বেরিয়েছিলাম দুঃখের ধান্ধায়।

ফিক্ করে হেসে ফেললে শ্যামলী। বললে, বিয়ে করেননি, ছেলেপুলের বালাই নেই—এতো দুঃখ-ধান্ধাই বা কিসের?

—মোটা ভাত, মোটা কাপড় নিজেকে তো চালিয়ে নিতে হবে!

শ্যামলী মুখ মুচকে অবিশ্বাসের হাসি হাসলো। অনেক কথাই বলবে ভেবেছিল শ্যামলী কিন্তু সামনাসামনি কথা বলতে গিয়ে সব কথারই খেই হারিয়ে গেল। কোন্‌টা বলবে আর কোনটা না বলবে খুঁজে পেলে না, কেমন যেন দিশেহারা হ'য়ে গেল।

অপর পক্ষের অবস্থাও তদ্রূপ। আকস্মিক কথা বলার আহ্বানে জরিফও কেমন অভিভূত হয়ে গেল। নিশুতি রাতে কথা বলার অপূর্ব্ব সুযোগ সে যেন হেলায় হারাতে বসেছে।

দুজনেই পরস্পর পরস্পরের দিকে চেয়ে রইলো পলকবিহীন নেত্রে। বাক-শক্তিহারা দু'টি প্রেমিক-প্রেমিকার ব্যবধানমূলক নৈশ অভিসার। হোক মর্ম্মান্তিক—হোক করুণ, তবু অন্যের চোখে অবস্থাটা ওদের সত্যিই উপভোগ্য নয় কি?

হিন্দু-মুসলিম এক হও! হিন্দু-মুসলিম এক হও!! হিন্দু-মুসলিম এক হও!!!—সারা সহর ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হ'য়ে উঠলো। ভোর না হতেই সহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে দলে দলে হিন্দু-মুসলমান শোভাযাত্রা সহকারে বেরিয়ে পড়লো। সহরের বড় বড় রাস্তাগুলি প্রদক্ষিণ করে তারা সভাস্থলে গিয়ে যোগদান করবে—অন্যায়ের, অবিচারের, অত্যাচারের প্রতিবিধানের জন্য।

বড় বড় লরীর ওপর কংগ্রেসের পতাকা আর মুসলিম লীগের পতাকা একসঙ্গে বেঁধে উভয় সম্প্রদায়ের লোক সমস্বরে 'হিন্দু-মুসলিম এক হও'—ধ্বনি সহকারে দারুণ উদ্দীপনায় ছুটে চলেছে সহরের বুকের ওপর দিয়ে।

লরী, ঘোড়ার গাড়ী, ট্যাক্‌সী, গ্যাসপোষ্ট যত্র-তত্র দু'খানি পতাকা গায়ে গা মিলিয়ে একসঙ্গে উড়ছে। আর সবার মুখে ঐ

একই বুলি,—'ইংরাজ ভারত ছাড়'! 'জয় হিন্দ'! 'হিন্দু-মুসলিম এক হও'!

আগের দিন আই-এন-এর বন্দীদের মুক্তির দাবী নিয়ে মিলিত হিন্দু-মুসলমানের এক বিরাট শোভাযাত্রা বেরিয়েছিল। শোভাযাত্রার উদ্দেশ্য ছিল কার্জ্জন পার্কে গিয়ে মিলিত হওয়া এবং সভা করা।

নিষিদ্ধ এলাকা দিয়ে শোভাযাত্রা যেতে দেওয়া হবে না—বলে কর্ত্তৃপক্ষ হুকুমনামা জারি করেন। শোভাযাত্রায় যোগদানকারী হাজার হাজার লোক প্রতিবাদ জানিয়ে রাস্তার ওপরই বসে পড়ে। সারাদিন—সারারাত সেই একই অবস্থায় তাদের কাটাতে হয়। কর্ত্তৃপক্ষ তাদের গোঁ বজায় রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

জনতাকে শেষ পর্য্যন্ত সরিয়ে দেবার জন্য গুলি ছোড়া হয়—ফলে বহু নিরীহ হিন্দু-মুসলমান প্রাণ দেন।

তাই আজ ভোর না হ'তে হতেই বিক্ষোভ প্রদর্শনকারী নরনারীর এই মৃত্যু অভিযান! তাইতো আজ দিকে দিকে ধ্বনিত হচ্ছে—'হিন্দু-মুসলিম এক হও'!

সারাটা দিন জরিফের পথে পথেই কাটলো। কাটলো হুজুকে মেতে নয়—পয়সার ধান্ধায়। মহিমের স্কন্ধে ভর করে সে আর কতদিন কাটাবে, আর কাটাবেই বা কেন? মহিমের সে তো মোসাহেব নয়—বন্ধু! হ'তে পারে সে বড়লোক কিন্তু মর্য্যাদার দিক দিয়ে জরিফ তার চেয়ে কোন অংশেই ছোট নয়। ভগবান দিয়েছে তাকে ঐশ্বর্য্য আর জরিফ পেয়েছে ঐ ঐশ্বর্য্যের চেয়ে অনেক বড় জিনিষ—সৃষ্টির ক্ষমতা। একজন লক্ষ্মীর বরপুত্র আর একজন বাণীর পূজারী, কে বড়?

প্রকাশকদের দোরে ধন্না দিয়ে দিয়ে মনটা তার তিক্ত হয়ে উঠলো। ওদেরই বা দোষ কি, কাগজের 'কোটা' সদাশয় সরকার বাহাদুর এমনভাবেই আঁট-সাট করে বেঁধে দিয়েছেন যে উপন্যাস ছাপা তো

দূরের কথা, স্কুলের ছেলেদের পাঠ্যপুস্তকও চাহিদা অনুপাতে ছাপা হচ্ছে না। অর্দ্ধেক ছেলে পাঠ্যপুস্তক কোনরকমে সংগ্রহ করেছে আর বাকি অর্দ্ধেক ছেলের পড়বার বই নেই। বেচারীরা যেখানে যায় সেখানেই শোনে—বই ছাপা নেই। ছাপা হবে কিনা সে বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ আছে! কাগজ পাওয়া যাচ্ছে না, বই বেরুবে কেমন করে। ফলে স্কুলের মাষ্টাররা ধমক দেয় ছেলেদের আর ছেলেদের কাছে ধমক খায় গোবেচারী, নিরুপায় বাপ-মা!

লেখার আনন্দে লিখে যারা খাতার পাতা ভর্ত্তি করতে চায় তাদের করতে দাও, তাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু পয়সার চাহিদা যাদের আছে, তারা শুধু লিখেই সন্তুষ্ট হ'তে পারে না, আশু ফলের প্রত্যাশী তাদের হ'তেই হয়! জরিফ এদেরই সগোত্র।

বায়োস্কোপের ভাড়াটিয়া লেখক হবার ইচ্ছা কোনদিনই জরিফের ছিল না। ওখানে নিজের নিজস্বকে বিসর্জ্জন দিয়ে লিখতে হয় ফরমাজী লেখা। অর্ডার দিয়ে জুতো তৈরী করান যায় কিন্তু গল্প লেখান যায় না! কিন্তু সে কথা বুঝবেই বা কে আর বোঝাবেই বা কে! তাদের কাছে লেখক আর মিস্ত্রী সমান পর্য্যায়ের লোক। মিস্ত্রী যদি অর্ডার অনুযায়ী জুতো মানান সই করে তৈরী করে দিতে পারে, লেখকই বা ফরমাজী লেখা লিখতে পারবে না কেন! লজিকের দিক দিয়ে কে ওদের ঠেকাবে?

দরকার নেই ওদের ঠেকিয়ে, পয়সাটা তো ঠিক মত দেবে! ছবির বইয়ের ফরমাজী সংলাপই লিখবে জরিফ। মহিমের অর্থাৎ সোফিয়া বেগমের কৃপাপ্রার্থী হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে বায়োস্কোপের চোখ-ধাঁধানো সস্তা গল্পের সে সংলাপই লিখবে।

আজ একটা হেস্তো-নেস্তো না করে জরিফ বাড়ী ফিরবে না। বন্ধু হিমাদ্রি বায়োস্কোপের একজন বড় নামকরা পাণ্ডা। মাসখানেক

আগে সে সেধে এসে অনুরোধ করেছিল ছবির বইয়ের সংলাপ লেখবার জন্ম, সেদিন সে 'ভেবে দেখি' ব'লে প্রকারান্তরে বন্ধুবরের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানই করেছিল। তখন কে জানতো যে খুব শীগগিরই একদিন হিমাদ্রির ঘর বয়ে গিয়ে জরিফকে তার সম্মতি জানিয়ে আসতে হবে!

—বেশ তো লোক আপনি! কোন্‌দিন গাড়ী চাপা না পড়েন! শ্যামলীর অতর্কিত তিরস্কারে চমক ভাঙলো জরিফের।

—তুমি—মানে আপনি এখানে?

—মেয়েদের শোভাযাত্রার ভেতর আমিও যে ছিলুম। মিটিঙ্‌ শেষ করে তবে তো আসছি। বলতে বলতে মুখের ওপর উড়ে আসা রুক্ষ চুলগুলো সরিয়ে দিলে শ্যামলী।

—আপনার মত কতগুলি 'হুজুকপ্রিয়' শোভাযাত্রায় যোগ দিয়েছিলেন?

চোখ দুটো জ্বলে উঠলো শ্যামলীর। নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, 'ইংরাজ ভারত ছাড়' প্রবন্ধ লিখে আপনিই নয় জেলে গিয়েছিলেন? সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে আপনিই বা কম হুজুকপ্রিয় কোনখানটায়?

উত্তেজনার বশে আরো কি যেন বলতে যাচ্ছিল শ্যামলী। জরিফ বাধা দিয়ে বললে, এখানে আপনার কোন অভিভাবক নেই বটে কিন্তু রাস্তার লোক আছে। কাজেই একটু আস্তে কথা বলুন!

দস্তুরমত ক্ষুণ্ণ হলো শ্যামলী। নীরবে সে জরিফের পাশে পাশে পথ চলতে লাগলো। জরিফের সঙ্গে উদ্দেশ্যবিহীন হ'য়ে পথ চলতেই যেন সে চির অভ্যস্ত! শুধু চলা নয়—প্রিয়তমের অম্ল-মধুর তিরস্কার সে যেন শুনে আসছে যুগযুগান্তর ধরে। মায়া-মোহ-প্রেমের মাদকতায় জরিফের কাছে শ্যামলীর অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লুপ্ত প্রায়—এক মন—একই সত্তা।

হঠাৎ যেন চমক ভাঙলো জরিফের।

—এদিকে কোথায় চলেছো?

—তা আমি কেমন ক'রে জানবো! বললে শ্যামলী অনুরাগ মিশ্রিত কৃত্রিম রুক্ষত কণ্ঠে।

—বাঃ আমি ভেবেছি—এদিকে আপনার কোন কাজ আছে।

এবার ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটলো শ্যামলীর। বললে, আমিও তো ঠিক একই কথা ভেবেছি।

—কাজ অবশ্য এদিকে আমার একটু ছিল কিন্তু আপনার সঙ্গে দেখা হবার পর সে কথা ভুলে গিয়ে অনেকখানি এগিয়ে এসেছি। এখন আর ফিরে যেতে ইচ্ছা হচ্ছে না। তা ছাড়া আমার পক্ষে আজকের দিনটাই নিষ্ফলা, যাত্রা না বদলালে সুফলের আশা নেই!

শ্যামলী ওর মুখের দিকে এতক্ষণে চোখ তুলে চাইলে। মধুর কণ্ঠে বললে, আপনি এসব মানেন?

মানতাম না ঠিক আর আজও যে মনে প্রাণে মানি তা বললেও সত্যের আপলাপ করা হয়—তবে সংস্কার বড় বালাই। সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পড়লে বাধ্য হ'য়ে যেন মানতে ইচ্ছা হয়।

—ঠিক বুঝলুম না!

হাসলে জরিফ। বললে, যেমন ধরুন—ওলাবিবি হচ্ছে মুসলনের দেবতা—হ্যাঁ দেবতাই বলা যায়, আর শীতলা হচ্ছে হিন্দুর বতা। দায়ে পড়লে হিন্দু মানে মুসলমানের 'ওলাবিবিকে' আর লমান মানে হিন্দুর 'শীতলাকে'। তাইতো আমরা যে ক্রমশঃ গঙ্গার র এসে পড়লুম—!

—ভালই হয়েছে। এদিকে অনেক দিন আসা হয়নি। গঙ্গার টা যে কোন পার্কের চেয়ে আমার বেশী ভাল লাগে। আপনারও

লাগা উচিত কারণ আপনি কবি! কয়েকমুহূর্ত্ত আগের মন-মরা শ্যামলী যেন মরে গেছে, এ আর এক নূতন জীবন্ত শ্যামলী কথা বলছে।

—ভাল ছাড়া আমারও খারাপ লাগে না। তবে আপনার যে সারাদিন খাওয়া হয়নি?

—আপনারও যে সারাদিন খাওয়া হয়েছে—চোখমুখ দেখে তাও তো বোধ হয় না। অবশ্য কবিদের চেহারা দেখে সব সময় সত্য-মিথ্যা অনুমান করা শক্ত।

হিঃ হিঃ করে হেসে ফেললে শ্যামলী।

গঙ্গার ঘাটে ঈষৎ নিরালা জায়গা একটা বেছে নিয়ে ওরা দু'জনে পাশাপাশি বসলো। চিনাবাদাম খেতে খেতে নতুন করে ওদের গল্প সুরু হলো। প্রথমেই অনুযোগের সুরে ভর্ৎসনা শুনতে হলো জরিফকে। পিছন থেকে প্রকাশ্য রাস্তায় পুরুষের উদ্দেশে মেয়েদের ডাকাডাকি করাটাই অভদ্রোচিত এবং শ্লীলতা হানিকর ব্যাপার। তাসত্ত্বেও শ্যামলী জরিফের উদ্দেশ্যে বার কয়েক ডাক দিয়েও সাড়া পায়নি। এতো অন্যমনস্ক হয়ে রাস্তা চললে যে কোন মুহূর্ত্তে বিপদ ঘটতে পারে। আত্মভোলা লোকদের উচিত সাবধানে নিজেকে বাঁচিয়ে রাস্তা চলা।

নিজের ত্রুটি স্বীকার না করা পর্য্যন্ত এবং ভবিষ্যতে সাবধানে রাজপথে চলাহাঁটা করার প্রতিশ্রুতি না দেওয়া পর্য্যন্ত শ্যামলীর সাবধানী তিরস্কারের বন্যা বহেই চললো।

রাজপথের পর এলো রাজনীতি। অন্যায়ের প্রতিকারে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা আর হুজুকে মাতা এক জিনিষ নয়। জরিফের মত বিচক্ষণ তরুণের কাছ থেকে এ ধরণের হালকা মন্তব্যে শুধু শ্যামলী কেন—যে কোন লোকের পক্ষেই ব্যথিত হওয়া স্বাভাবিক, তা সে মেয়েছেলেই হোক আর বেটাছেলেই হোক।

গোটা কয়েক চিনাবাদাম ছাড়িয়ে শ্যামলীর হাতে দিতে দিতে জরিফ বললে, তুমি আমায় ভুল বুঝেছো, শ্যামলী!

—হিন্দু-মুসলমানের এই মিলনকে আপনি হুজুক বলতে চান?

এবার গাম্ভীর্য্য টুটে গেল জরিফের। শ্যামলীর হাতখানি নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে জরিফ কবিজনোচিত কমনীয় কণ্ঠে বললে, হিন্দু-মুসলমানের মিলন যে ক্ষেত্রবিশেষে হুজুক নয়—তার প্রমাণ তো তুমি আর আমি!

—তবে আপনি আজকের এই জনস্রোতকে হুজুকপ্রিয় জনতা বলে উপেক্ষা করলেন কেন?

—কারণ ক্ষেত্রহিসাবে রাজনীতি আর প্রেম-নীতি এক নয়, শ্যামলী। হৃদয়ের যোগাযোগ যেখানে নেই, যেখানে আছে শুধু বাক্যাড়ম্বর, সাময়িক উত্তেজনা—যথার্থ মিলন সেখানে হয় না।

উত্তেজনার বশে জরিফের মুঠোর মধ্য থেকে হাতখানা টেনে নিয়ে শ্যামলী বললে, আজকের এই সূত্র অবলম্বন করে সত্যিকার মিলন কোনদিন যদি হয়!

ধীর, স্থির ভাবে জরিফ বললে, সত্যিকার সে সুদিন সুদূর ভবিষ্যতে যদি কোনদিন আসে তাহলে মুকুল ফুল হ'য়ে ফোটবার আগেই আমাদের আশা হবে আকাশ-কুসুম, মিলনের ভিত্তি হবে ধূলিসাৎ!

—ঠিক বুঝলাম না।

—তৃতীয় পক্ষ অর্থাৎ সদাশয় বৃটিশ সরকার তা কোন দিনই হতে দেবেন না। Divide and rule যাঁদের আবহমানকালের policy তাঁরা কি এই দুই সম্প্রদায়ের মিলন-সেতু বাঁধতে দিতে পারেন? মিলনের—সত্যিকার মিলনের বিন্দুমাত্র আভাস পেলেই কূট রাজনৈতিক চক্রান্তে তাঁরা তা ভেঙে দেবেন।

দু'হাতের চাপে একটা শক্ত বাদাম ভাঙতে চেষ্টা করতে করতে

শ্যামলী বললে, এবার অন্য কথা বলুন। সব সময় রাজনীতির কচ্ কচি আমার ভালও লাগে না আর মাথাতেও ঢোকে না।

—এমন একটা সময় ছিল যখন 'কানু ছাড়া গীত' হ'তো না। বর্ত্তমানে এমন একটা দিন এসেছে যখন প্রেম-চর্চ্চা করতে করতেও রাজনীতির চর্চ্চা আপনি এসে পড়ে। রাজনীতিকে বাদ দিয়ে আজকাল আর কোন আলোচনাই জমে না, শ্যামলী!

—তা ব'লে আমি কি আপনাকে প্রেমশাস্ত্র আলোচনা করতে বলেছি!

ভ্রুকুটি করে রহস্যের ছলে জরিফ বললে, সব চেয়ে মেয়েরা কিসে বেশী আনন্দ পায় জানো?

—কিসে?

—আত্মপ্রবঞ্চনা করে।

—আমি কিন্তু এখুনি এখান থেকে একলা চলে যেতে পারি তা জানেন!

—আর মেয়েদের এই কৃত্রিম ক্রোধটা হচ্ছে ঐ আত্মপ্রবঞ্চনার অলঙ্কার! আহা—সত্যি সত্যি উঠো না!

শ্যামলীর হাত ধরে জোর করে নিজের পাশে বসালে জরিফ।

ক্ষণেক নীরবতার পর শ্যামলী আকস্মিক ভাবে প্রশ্ন করলে, আচ্ছা, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করবো—সত্যি উত্তর দেবেন?

—যতদূর সম্ভব চেষ্টা করবো।

—আমি ছাড়া আর কতগুলি তরুণীর শরণ আজ পর্য্যন্ত আপনি নিয়েছেন?

শ্যামলীর দোদুল্যমান বেণীতে একটা টান দিয়ে জরিফ বললে, যদি বলি—তুমিই একম্ অদ্বিতীয়ম্ কেবলম্!

নিজের মনে শ্যামলী যেন নিজেই বললে, কি কাজ করেছি!

—সত্যিই যদি তুমি আমায় ভালবেসে থাকো—বিশ্বাস কর, অন্যায় কিছুই করোনি। তরুণীর শরণ নেবার সৌভা[illegible]র কোনদিনই হয়নি। যাগকে ও সব বাজে কথা, চল— [illegible]রা যাক!

শ্যামলী একটা হাই তুলে বললে, এরই মধ্যে?

—ট্যাক্সি খরচা তো আমার পকেটে নেই। এতটা পথ তোমাকে আমার হাঁটিয়েই নিয়ে যেতে হবে।

—এরই মধ্যে আমার এতখানি দায়িত্ব আপনি নিয়ে ফেললেন? নাঃ লক্ষণ বড় ভাল মনে হচ্ছে না! মুখটেপা হাসি হাসতে লাগলো শ্যামলী।

জরিফের মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গেল, আচ্ছা শ্যামলী, আর কখনো তুমি কারো সঙ্গে প্রেম করেছো?

—ইচ্ছা ছিল তবে সুযোগ-সুবিধা ঘটে ওঠেনি।

ক্ষণেকের জন্য স্তম্ভিত হ'য়ে গেল জরিফ। তারপর আহত কণ্ঠে বললে, সুযোগ-সুবিধা ঘটলে—

জরিফের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে শ্যামলী বললে, নিশ্চয় করতাম। অবশ্য মন যাকে চাইতো!

চিন্তা জড়িত কণ্ঠে জরিফ বললে, তবে অনুমানে বোধ হচ্ছে—এই তোমার প্রথম প্রেম!

জরিফের দ্বিধা জড়িত কণ্ঠস্বর শুনে হেসে লুটিয়ে পড়লো শ্যামলী।

* * * *

সকালে বিছানা ছেড়ে প্রতিদিনের অভ্যাস মত শ্যামলীর জানলার দিকে চাইলে জরিফ। শ্যামলী আজ জানলায় নেই। নমস্কার বিনিময় না করে মুখ হাত ধুতে সে যায় কেমন করে! সিগারেট ধরায় জরিফ—দৃষ্টি কিন্তু তার ঐ জানলায়। চেয়ে চেয়ে সিগারেট শেষ হ'য়ে গেল,

শ্যামলীর তবু দেখা নেই। দরজায় ধাক্কা পড়লো—চা প্রস্তুত। ক্ষু মনে [illegible] গিয়ে জরিফ দরজা খুলে দিলে। চা দিয়ে গেল চাকর —এমন শ্যাম[illegible]র ক্রমশঃই মনটা তার বিষিয়ে উঠলো।

[illegible]নে এম[illegible] দিয়ে এসে সে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে চায়ের পিয়ালা চুমুক দিলে। মনে হলো—পিয়ালাটা আছাড় মারে মেঝের ওপ[illegible] এমন বিশ্রী চা সে জীবনে কোনদিন খায়নি!

হঠাৎ মুখ তুলে চাইলে জরিফ—দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে দাঁড়ি[illegible] আছে আলুলায়িত-কুন্তলা সদ্য ঘুম-ভাঙা শ্যামলী।

এক মুহূর্ত্তে সমস্ত বিতৃষ্ণা মুছে গেল জরিফের মন থেকে। চা[illegible] সমেত পিয়ালাটা হাসি মুখে সে কপালে ঠেকালে। চায়ের পিয়ালা[illegible] এবার চুমুক দিতে মনে হলো—এমন ভাল চা বহুদিন জরিফ খায় নি।

—নমস্কার! সোফিয়ার মৃদু মধুর কণ্ঠস্বরে চমক ভাঙলে জরিফের।

সোফিয়ার সঙ্গে শ্যামলীর চোখোচোখি হওয়া মাত্র সে বিদ্যুৎগতিতে সরে গেল জানলার ধার থেকে। একবার জানলার দিকে আর একবার জরিফকে দেখে নিয়ে স্মিত হাসি ঠোঁটের কোণে টেনে এনে সোফিয়া বললে, I am sorry—really sorry!

বিহ্বল জরিফের মুখ দিয়ে চট্ করে একটা কথাও বেরুলো না। কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য সে যেন বাক্‌শক্তি হারিয়ে ফেললে। সোফিয়া কখন যে তার ঘরের ভেজান দরজা ঠেলে এসে ঢুকেছে তা সে মোটে টেরই পায়নি। অন্য কেউ হলে আশ্চর্য্যের কিছু ছিল না—কিন্তু সোফিয়া যে এখানে এ সময় আচম্বিতে এসে হাজির হতে পারে—এ কথা শুধু জরিফ কেন, যে-কোন লোক কল্পনাও করতে পারে না।

এমন সঙ্কটজনক মিলন-মুহূর্ত্তে একান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে এখানে

এসে পড়ে সোফিয়াও কম লজ্জিত হলো না। এরই নাম ছন্দিত ঘটনা-বৈচিত্র্য!

—বসতে পারি?

সোফিয়ার কথায় রহস্যের আভাস পেয়ে যেন কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হলো জরিফ। বললে, এসেছেন যখন মেহেরবানি করে তখন এ গরীবের গরীবখানায় নিশ্চয় বসবেন!

—এ যেন যেচে মান আর কেঁদে সোক! তাই নয় মিয়াসাহেব?

—অবশ্য, বসতে আপনাকে আগেই বলা আমার উচিত ছিল কিন্তু—

—কিন্তু ভয়, বিরক্তি, রাগ, লজ্জায় সাধারণ ভদ্রতাটুকুও ভুলে গেছলেন। হয়—ও-রকম অবস্থায় আমিও একদিন পড়েছিলাম। তবে দেখবেন—'গাছে তুলে যেন মই কেড়ে নেবেন না'!

জরিফ নীরব।

—কিছু মনে করবেন না। আমি ভুক্তভোগী কিনা তাই আপনাদের পুরুষ জাতটাকে একটু ভয়ের চোখেই দেখে থাকি।

—অর্থাৎ আমরা কি পশু?

—সময় বিশেষে তার চেয়েও নিম্নস্তরের জীব, কারণ নেশা কেটে গেলে অর্থাৎ আশা মিটে গেলে আপনারা আমাদের পোড়া সিগারেটের পরিত্যক্ত টুকরো ছাড়া আর তো কিছুই মনে করেন না!

—কোন একটা বিশেষ উদাহরণ দিয়ে সকলকে একই কাঁটায় ওজন করা যায় না, বেগমসাহেবা! তা ছাড়া নিজের জাতের স্বপক্ষে শুধু ওকালতি ক'রে বড় হওয়া যায় না, পুরুষ জাতেরও বলবার অনেক কিছু আছে—যা অবশ্য আপনার অজানা নয়। মাপ করবেন বেগমসাহেবা, বুঝতেই পাচ্ছেন—মনটা আমার ভাল নেই।

হাসলে সোফিয়া। বললে, মনটা খারাপ হবার কারণ তো কিছুই

ঘটে। ওটা আপনার মনের অহেতুক ভ্রম বা ভয়ও বলা যায়। হয়—প্রথম প্রথম ও-রকমটা হয়।

—চা খাবেন ?

—ধন্যবাদ ! সত্যি আপনার ভদ্রতায় আমি মুগ্ধ।

সলজ্জকণ্ঠে জরিফ বললে, কিছু মনে করবেন না বেগমসাহেবা, কথা কাটাকাটি করতে করতে আমি এতক্ষণ ভুলেই গিয়েছিলাম আপনাকে চা খাবার কথা জিজ্ঞাসা করতে।

—মনে করাকরির কি আছে, কবি বা সাহিত্যিকদের ও-লাইসেন্সটুকু আমরা দিয়েই থাকি! তবে চা-র জন্য বর্ত্তমানে আপনাকে ব্যস্ত হ'তে হবে না, ও-জিনিষটার অভাব এখন আমি মোটেই বোধ কচ্ছি না।

সিগারেটটায় পর পর কয়েকবার টান দিয়ে যেন শক্তি সঞ্চয় করে নিলে জরিফ। বললে টেনে টেনে, আচ্ছা, আপনাদের যে আমরা পোড়া সিগারেটের টুক্‌রোর মত দূরে ছুড়ে ফেলে দিই—একথা আপনাকে কে বললে ?

স্বচ্ছ গলায় সোফিয়া বললে, আপনি—!

—আমি ! বিস্ময়ে জরিফ ফেটে পড়লো।

—এ মাসের 'উদয়াচল' পত্রিকায় আপনার নিজের লেখা গল্পটা নিজেই একবার পড়ে দেখবেন! আচ্ছা আসি, নমস্কার! বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল সোফিয়া।

জরিফ বললে বিস্ময়ভরা কণ্ঠে, সেকি! হঠাৎ আপনি এলেনই বা কেন আর যাচ্ছেনই বা কেন—ব্যাপার তো কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।

—ব্যাপার একটা কিছু তো নিশ্চয়ই আছে, নইলে হঠাৎ এসে আপনাকে এভাবে বিব্রত করবো কেন। তবে ভেবে দেখলাম,—

আপনার দ্বারা আমাদের বিশেষ সুবিধা হবার কোন আশাই নেই। বলে চলে যাবার উপক্রম করলে সোফিয়া।

জরিফ শশব্যস্তে উঠে তার পথ রোধ করে দাঁড়াল। বললে, বসুন—বসুন! আপনি আমায় ভুল বুঝে অযথা আমার ওপর রাগ কচ্ছেন!

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে শ্যামলী তার জানলার ধারে এসে এক লহমার জন্য দাঁড়াল ওদের অলক্ষ্যে। জরিফের ব্যস্ততা এবং তার আকুল মিনতি—শ্যামলীর দৃষ্টি এবং কর্ণ কোনটাকেই এড়িয়ে গেল না। শ্যামলী পাছে ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাই চট্ করে সরে গেল জানলার ধার থেকে।

—রাগ, ভুল, দুঃখ—কোনটাই আমি কচ্ছি না। তবে কি জানেন, মাপ কর্ব্বেন অবশ্য—বোধ হয় মেয়েছেলে বলে এতক্ষণ আপনি আমার সঙ্গে একঘর কথা বললেন অথচ যার সম্পর্কে আপনার সঙ্গে সম্বন্ধ তার কথা আপনি একটিবারও উচ্চারণ করলেন না! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বললে সোফিয়া।

—কেন—কেন—কি হ'য়েছে মহিমের?

—সে কথা থাক, পরে একদিন শুনবেন। আমি এখন চললাম! আমি যে কতখানি ব্যস্ত তা নিজেই এতক্ষণ আমি ভুলেছিলাম। এতখানি বিপদে—এ ভাবে কথা বলা বোধ হয় এক আমাতেই সম্ভব! নমস্কার! জরিফকে পাশ কাটিয়ে ত্রস্ত পদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সোফিয়া।

শুনুন! শুনুন! শুন্ছেন!

বারেকের তরে ফিরেও চাইলে না সোফিয়া। ক্ষণেকের জন্য পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইলো জরিফ। তারপর কোন দিকে না চেয়ে পাগলের মত জুতাটা পায়ে গলিয়ে জামাটা গায়ে দিতে দিতে সেও

ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। অবিন্যস্ত চুলে চিরুণী দেবারও সময় নেই।

উভয়ের নাটকীয় নিষ্ক্রমণ ও বিপুল ব্যস্ততা—জানলার পাশ থেকে সবই লক্ষ্য করলে শ্যামলী।

মিথ্যা বলেনি সোফিয়া, বিপদটা তাদের একান্ত আকস্মিক এবং সাঙ্ঘাতিক। আকস্মিক এই কারণে যে—চোরাবাজারে কার-কারবার বহুদিন থেকেই করে আসছে মহিম কিন্তু ধরা পড়লো এই প্রথম একান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে। আর সাঙ্ঘাতিক অর্থে—মহিমের হাজতবাস!

জামিন দেবার বহু চেষ্টা করেও যখন সবাই অকৃতকার্য্য হলো, কোন রকমেই মহিমকে জামিনে ছাড়িয়ে আনা গেল না—তখন সোফিয়া শরণাপন্ন হ'তে গিয়েছিল জরিফের।

দুনিয়ায় এমন অনেক কাজ আছে যা পয়সার জোরে হয় না—তদ্‌বিরের জোরে হয় না, হয় গুণী লোকের একটি মুখের কথায়—খাতিরেও বলা যায়।

মহিমকে জামিনে আপাততঃ খালাস করে আনবার জন্য জরিফ গিয়ে হাজির হলো Chief Presidency Magistrate-এর বাড়ী। ইনি একজন সত্যকারের সাহিত্য-রসিক, সাহিত্যিক হিসাবে ভদ্রলোক জরিফকে পুত্রাধিক স্নেহ করেন। এঁর সাহায্যে বহু দুঃস্থ লোকের উপকার করেছে জরিফ। জরিফের কথা তিনি কোনদিন ফেলতে পারেন নি। জরিফও কোনদিন তাঁকে অন্যায় অনুরোধ করেনি। একদিন তিনি শুধু প্রকারান্তরে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে—একমাত্র বিচার-সংক্রান্ত ব্যাপার ছাড়া জরিফের কোন অনুরোধ কোন দিন ফেলবেন না।

আজও তিনি জরিফের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলেন না। বরং নিজে তদ্‌বির করে মহিমকে জামিনে খালাস করিয়ে দিলেন।

পুরো দু'টি দিনের পর জরিফ তার মেসে ফিরলো। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে জানলার ধারে এসে দাঁড়াল। শ্যামলীর যে জানলা কোনদিনের জন্য বন্ধ হয়নি আজ সেই জানলা বন্ধ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল কিন্তু শ্যামলীর ঘরের জানলা আর খুললো না। রাগে, দুঃখে, অপমানে জরিফের চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসার উপক্রম হলো। কত কথাই না ভেসে এলো জরিফের মনে। হয়তো—হয়তো কেন, নিশ্চয়ই শ্যামলী জানে না যে জরিফ ফিরে এসেছে! এমন তো হতে পারে যে সে হঠাৎ অসুস্থ হ'য়ে পড়েছে! তাইতো—খবর নেবারই বা উপায় কি?

মহিমকে উদ্ধার করে তার যতো আনন্দ হ'য়েছিল ততোধিক দুঃখ হলো শ্যামলীর আজ দু'দিনের পর দেখা না হওয়ায়।

ঘরের ভিতর একা ব'সে থেকে থেকে প্রাণটা তার হাঁফিয়ে উঠলো। যেমন আলুথালু বেশে সে ঘরে গিয়ে ঢুকেছিল তেমনি বেশেই সে ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালো। উদ্দেশ্যবিহীন-ভাবে হাঁটতে সুরু করলে। পা আর চলে না, নিকটস্থ পার্কে গিয়ে বসলো জরিফ। কিছুক্ষণ বসে থাকার পর পার্ক আর ভাল লাগলো না। মন চায় নিরালা একটা কোণ।

কোলকাতার সহরে নিরালা কোণ মেলা শক্ত!

উদ্‌ভ্রান্ত জরিফ টিকেট কিনে ছবি দেখতে ঢুকলো। ইন্‌টারভ্যালে সিগারেট কিনতে বেরিয়ে জরিফ দেখতে পেলে শ্যামলীকে। আকুল আগ্রহে এগিয়ে গিয়ে জরিফ বললে, তুমিও এসেছো?

—চুপ—কথা বলবেন না, বাবা সঙ্গে আছেন! চাপা গলায় বলে ত্রস্তে একদিকে চলে গেল শ্যামলী।

ছবি দেখার স্পৃহা জরিফের ঘুচে গেল। শো আরম্ভ হবার সাঙ্কেতিক ঘণ্টাধ্বনি হবার সঙ্গে সঙ্গে দর্শকবৃন্দ ছবিঘরে ঢুকলো, জরিফ একা ছবিঘরের চত্বর পেরিয়ে রাস্তার ফুটপাথে এসে দাঁড়াল। কেন এখানে এসে দাঁড়াল, কতক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে কাটাবে—কি তার উদ্দেশ্য, তা সে নিজেই জানে না।

সিগারেট টানতে টানতে হঠাৎ নজর পড়লো জরিফের,—শ্যামলী তার বাবার সঙ্গে গাড়ীতে উঠছে। ছবিটা তাহ'লে ভাল লাগলো না, কিন্তু কার—? শ্যামলীর—না তার বাবার? ইংরাজি যে কোন ছবি যত খারাপই হো'ক—শ্যামলীর না দেখলে রাত্রে ঘুম হয় না। সেই ছবি শেষ না করে শ্যামলী চলে গেল! তাজ্জব ব্যাপার—।

পথে এক বান্ধবীর বাড়ীতে নেমে শ্যামলী তার বাবাকে ছেড়ে দিলে।

বাবা বললেন, তোর আজ কি হ'য়েছে বলতো, শ্যামলী? কোথাও কিছু নেই—হঠাৎ উঠলো ছবি দেখবার খেয়াল। টানতে টানতে আমাকে নিয়ে এলি ছবি দেখাতে। অর্দ্ধেক না দেখতে দেখতে ছবির খেয়াল মিটে গেল। এলি বন্ধুর বাড়ী—!

—আমি এখুনি ফিরবো বাবা! সুলতার সঙ্গে আমার একটু বিশেষ দরকার আছে। আপনি ফিরে যেতে না যেতে আমি বাড়ী ফিরে যাবো।

ভদ্রলোক একটা চুরুট ধরিয়ে বললেন, আমি তবে গাড়ীতেই বসি, তুমি তোমার দরকারটা সেরে এসো!

শুষ্ক, প্রাণহীন হাসি ঠোঁটের কোণে এনে বললে শ্যামলী, বাঃ রে আজ যে আমার এখানে নিমন্ত্রণ।

অর্থাৎ কালকের মত আজও তুমি বাড়ীতে কিছুই খাবে না। আচ্ছা, গত দু'দিন যাবৎ তোর কি হ'য়েছে বলতো? বাড়ীতে কেউ

কিছু তোকে বলেছে—? কার ওপর রাগ হ'য়েছে, সত্যি করে বলতো মা?

—কিচ্ছু হয়নি বাবা, কিচ্ছু হয়নি! তোমার চায়ের সময় হ'লো—তুমি আর দেরী করো না! ড্রাইভার—

কন্যা-অন্ত প্রাণ ভদ্রলোক মোটারে বসে আর কথা কাটাকাটি না করে কন্যার অনুরোধে একাই বাড়ীর পথে ফিরলেন।

নিমন্ত্রণের কথা-টথা স্রেফ বাজে, ও শুধু বাবাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা। তবে বান্ধবীর কথাটা মিছে নয়, কিন্তু বান্ধবীর সঙ্গে তার বিশেষ 'দরকার'টা সম্পূর্ণ মিথ্যা। চঞ্চল মনের এ এক খেয়াল, বা বৃদ্ধ পিতার সান্নিধ্য পরিত্যাগ করার একটা ছল।

নিমন্ত্রণ তাকে খেতে হলো না বটে কিন্তু চা না খাইয়ে বান্ধবী তাকে কিছুতেই ছাড়লো না। বহুদিন পরে দেখা, সুলতার জাহাজ ভর্ত্তি কথা—দু' পাঁচ মিনিটে কি ফুরোতে চায়! শ্যামলী কিন্তু অল্পেই অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠলো। নিজের জ্বালায় সে নিজে জ্বলছে—এ সময় কি সুলতার প্রেমোপাখ্যান, রোমান্স, বিরহ-কথা শোনবার তার সময়! সুলতা নিজের প্রেমিকের কথা শুনিয়ে আনন্দ পায়—বিনিময়ে শ্যামলী পায় ব্যথা। তার কথা কে শোনে তার ঠিক নেই, সে শুনবে অন্যের প্রথম প্রেমের রোমাঞ্চকর কাহিনী! খোলা মন সুলতার, নিজেকে সে মুক্ত করে দিতে চায় বান্ধবীর কাছে, কিন্তু শ্যামলী? ধরাছোঁয়ার ধার দিয়ে সে যেতে রাজি নয়—ভয়ানক চাপা। প্রেম তার নিজস্ব, কথাও তার ব্যক্তিগত, নিজের কথা সে অন্যকে জানতে দেবে কেন? সুলতার মত অত কাঁচা মেয়ে সে নয়!

পঞ্চাশ মিনিটের কথা জোর করে পাঁচ মিনিটে সেরে বিশেষ ব্যস্ততার দোহাই দিয়ে শ্যামলী বেরিয়ে পড়লো বান্ধবীর বাড়ী থেকে। বিরহ-ব্যথার বৃশ্চিক জ্বালায় সে জ্বলে পুড়ে মরছে। শান্তি নেই—

এ দুনিয়ায় কোথাও শান্তি নেই! উঃ কি ভয়ঙ্কর বেইমান ঐ পুরুষ জাতটা! আর সব চেয়ে সেরা বেইমান হচ্ছে—ঐ জরিফ! অম্লান-বদনে সেদিন সেই মেসের ঘরে নবাগতার উদ্দেশ্যে জরিফ প্রেমবিহ্বল গদগদ কণ্ঠে তারই চোখের সামনে বলে বসলো, "আপনি আমায় ভুল বুঝে অযথা আমার ওপর রাগ কচ্ছেন!" উঃ এ কথা কি ভোলা যায়! প্রেমিকার মান ভাঙাবার জন্যে প্রেমিকের আকুল কণ্ঠের আর্ত্ত নিবেদন। জরিফের মুখ থেকে এমন নিদারুণ কথা শোনবার আগে মৃত্যুও ছিল ভাল শ্যামলীর। নাঃ পারতপক্ষে সে আর জরিফের মুখ দর্শন করবে না। বুকখানা তার ফেটে গেলেও সে কোনদিনের জন্য ছায়া মাড়াবে না জরিফের। জরিফ নিষ্ঠুর, ... বেইমান, জরিফ ছলনার মূর্ত্তপ্রতীক!

আচম্বিতে মোটার ব্রেক্ কসার শব্দে শ্যামলী... চিন্তার খেই হারিয়ে গেল। আধুনিকা বলেই বোধ হয় শ্যাম... ড্রাইভারের বাক্যবাণের হাত থেকে রেহাই পেলে—নইলে ওদের ...তীয় ভাষায় অপ্রিয় কিছু-না-কিছু শুনতে হতো।

চমক ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে শ্যামলীর বুকটা ছাঁত্ ...রে উঠলো। সত্যিই তো—এটা রাজপথ, তাদের বাড়ীর চত্বর বা ক...-ঘেরা ছাত নয় যে বেপরোয়া ভাবে চললেই হলো। রাস্তা পেরিয়ে ফুটপাথে উঠতে যাবে শ্যামলী—পিছন থেকে চাপা গলায় কে যেন বললে, Doctor, heal thyself!

মুখ ফিরিয়ে দেখলে শ্যামলী—জরিফ ঠিক তার পাশে। রাগ হলো না শ্যামলীর! আচ্ছা, বায়োস্কোপের প্যাঁচ তো। ছবি ঘরে যাকে আধ ঘণ্টা আগে দেখে এলাম—সে হঠাৎ পাশে এসে দাঁড়াল কেমন করে। কৈ, শো তো শেষ হ'য়ে যাবার সময় এখনো হয়নি।

—কথা বলছো না যে? সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলে জরিফ।

মুখ না ফিরিয়ে একটু জোরে পা ফেলতে ফেলতে শ্যামলী বললে, ব্যস্ত আছি।

—তা তো দেখতেই পাচ্ছি, তা নইলে আর মোটার চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে যাও!

—সে তো আপনারই জন্যে! বলতে গিয়ে চট্ করে নিজেকে কষ্ট করে সামলে নিলে শ্যামলী। শুধু সামলে নিলে না, মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিলে। ছিঃ মুখ দিয়ে কথাটা বেরিয়ে এলো—ছিঃ ছিঃ মরেছে সে একেবারে।

জরিফ শ্যামলীকে নীরব দেখে নিজেই কথা বললে, সেদিন আমাকে তুমি পথ চলার সম্বন্ধে উপদেশ দিচ্ছিলে আর আজ নিজে?

—যদি কোন কাজের কথা থাকে চট্‌পট্ বলতে পারেন!

হাসি এলো জরিফের মুখে। কাজের কথা! নাঃ শ্যামলী তার ওপর যে-কোন কারণেই হো'ক বেজায় চটেছে। চটবার কারণ যে একেবারে নেই এমন নয়, দু'দিনের দীর্ঘ অনুপস্থিতি! তারই প্রাণটা হাঁপিয়ে উঠেছে—দুনিয়া দেখছে অন্ধকার, শ্যামলী তো মেয়েছেলে!

—হ্যাঁ, কাজের কথাই তো বলছি। শোন—, ফটকার বাজার আজ পাঁচ মিনিটে গেল নেমে।—আর বুঝলে পালং শাকের সের বিক্রী হচ্ছে সাড়ে আট আনা।

কৃত্রিম ঝঙ্কারে ঈষৎ চাপা গলায় শ্যামলী বললে, ও সব শোনাবেন—আপনার সেই ঝড়ের মত উড়ে আসা বান্ধবীকে, যার মান ভাঙাতে আপনি সেদিন পাগলের মত পড়ি কি মরি হ'য়ে পিছনে পিছনে ছুটেছিলেন।

ক্ষণেক স্তব্ধতার পর জরিফ কতকটা যেন নিজের মনেই বললে, গলদ যে কোথায়—তা দেবাঃ ন জানন্তি, কুতো মনুষ্যাঃ। আমি

ভেবেছি—স্রেফ্ বিরহ-ব্যথা! যাক সে কথা, শোন বন্ধু! তুমি আমায় ভুল বুঝেছো?

শ্যামলীর দিক থেকে কোন উত্তরই এলো না।

জরিফই কথা বলতে বাধ্য হলো নিজের গরজে, বাজার দরটা তাঁকেই আমি শোনাতে পারতাম যদি তাঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধটা হ'তো তোমারি মত!

এবার শাসিয়ে উঠলো শ্যামলী, যান্—যান্—অত বোকা মেয়ে আমি নই। ওসব মনগড়া ছেঁদো কথা অন্যকে ইনিয়ে-বিনিয়ে বোঝাবেন। আমি কিছু বুঝি না—না? 'আপনি আমায় ভুল বুঝে অযথা আমার ওপর রাগ কচ্ছেন' পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে ছল-ছল চোখে ধরা গলায় কে সেদিন তার সামনে দাঁড়িয়ে বলছিল!

—রাস্তা চলতে চলতে ঝগড়াটা ঠিক জমছে না, শ্যামলী! চল—ঐ পার্কের একটা নিরালা জায়গা বেছে নিয়ে দুজনে নতুন করে ঝগড়া সুরু করি।

—আপনার ঝগড়া করার দরকার থাকে, আপনি যান। আমার কাজ আছে। শ্যামলী অনিচ্ছাসত্ত্বে জোরে চলে।

—তুমি কি পাগল হলে শ্যামলী, একা একা কখন ঝগড়া করা যায়—না জমে! বিশেষ করে—যে আসরে মেয়েছেলে নেই সে আসরে আর যাই জমুক—ঝগড়া জমে না। অথচ মজা এই—ঝগড়াটে নারদ ছিল ব্যাটাছেলে। এই তো এসে গেছি—।

বলতে বলতে খপ্ করে শ্যামলীর একখানি হাত নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে জরিফ পার্কের গেটের মধ্যে ঢুকে পড়লো।

অবস্থাটা এমনি সঙ্গীন যে শ্যামলীর বাধা দেওয়া মোটেই চলে না। ব্যাটাছেলের সঙ্গে হাত কাড়াকাড়ি করা যে কোন জনবহুল স্থানে মোটেই সমীচীন ও সঙ্গত নয় মেয়েছেলের পক্ষে। সন্দিগ্ধ চোখের

সামনে কোন একটা ক্ষুদ্র খুঁত ধরা একবার পড়লে হয়। দু'জনের অপদস্থের আর সীমা পরিসীমা থাকবে না। শ্যামলীর মুখের একটি ক্ষুদ্র, তুচ্ছ আর্তনাদে কী ভীষণ, ভয়াবহ, লজ্জাজনক ব্যাপারই না ঘটতে পারে? এক পক্ষ বলবে, ব্যাটাছেলেটির হাত ধরার অধিকার না থাকলে মেয়েছেলেটির হাত ধরতে সাহস করবে কেন? অপর পক্ষ বলবে, নারী স্বাধীনতার যুগ-সন্ধিক্ষণে পুরুষ করবে প্রকাশ্য পার্কে নারীর অসম্মান! মেরে ব্যাটার পস্তা উড়িয়ে দাও!

শ্যামলীর মনের ভাব ভাষার রূপ দিতে যতটা সময় লাগলো এর শতাংশের একাংশ সময়ও লাগল না তার সমস্ত ব্যাপারটা ভেবে নিতে। অতি সহজ এবং শান্তভাবেই সে নিজেকে জরিফের হাতে সমর্পণ করে তার পাশে পাশে এগিয়ে চললো। আত্ম-সমর্পণের আরও একটা কারণ আছে—তা হ'চ্ছে প্রেমিকের বৈদ্যুতিক স্পর্শন। হাতে হাত লাগায় প্রেমের যে বৈদ্যুতিক ক্রিয়ার উদ্ভব হয় এবং যা ছড়িয়ে পড়ে প্রেমিক-প্রেমিকার সারা দেহে ও মনে—তা এড়িয়ে যাবার ক্ষমতা খুব কম মানুষেরই আছে!

সারা পার্ক শুধু শুধু ঘোরাই সার হলো, একটা বেঞ্চিও খালি নেই। নিরালা স্থান তো চুলোয় যাক, প্রকাশ্য স্থানেও একটু স্থান সংগ্রহ করতে পারলে ওরা ধন্য হ'তো। নিরূপায় হ'য়ে ওরা একধারে ঘাসের ওপরই বসে পড়লো।

মাসকয়েক পরের কথা।

হঠাৎ যেন সহরের আবহাওয়াটা ভিতরে ভিতরে গরম হ'য়ে উঠলো। অথচ বাইরে থেকে কোন কিছু বোঝবারই উপায় নেই। মুসলিম লীগ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস ঘোষণা করলেন—১৬ই আগষ্ট

১৯৪৬। কিন্তু এ সংগ্রাম কার বিরুদ্ধে? নিশ্চয়ই তৃতীয় পক্ষ অর্থাৎ ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে?

নির্দ্ধারিত তারিখে ব্যাপারটা যেন অন্যরকম মনে হলো। তবে কি যে মনে হলো তাও সঠিক করে বলা শক্ত।

দিনের আলো ধরণীর বুকে ছড়িয়ে পড়তে না পড়তে দিকে দিকে সুরু হ'য়ে গেল প্রলয়ের তাণ্ডব নর্ত্তন। লুট-পাট, অগ্নিকাণ্ড, খণ্ডযুদ্ধ! এক সম্প্রদায় যেন আর এক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে হঠাৎ ক্ষেপে গেল। সহরের নিরীহ নরনারী এই অকল্পিত, আকস্মিক বিপদের সম্মুখীন হ'য়ে যেন দিশেহারা হ'য়ে পড়লো। যেন কোন সে এক মারাত্মক মন্ত্রের মাদকতায় সারা সহরের লোক পাগল হ'য়ে গেল। সব কিছু ভেঙে চুরমার করে দাও—করে দাও লণ্ড-ভণ্ড, জ্বালাও আগুন—বাধুক বিংশ শতাব্দীর লঙ্কাকাণ্ড! বহে যাক রক্তের নদী! খুন-জখম—বীভৎস হত্যালীলা! রক্ত-পাগল মানুষ রক্তের তৃষায় ছুটে চলেছে দিক্-বিদিকে! চাই রক্ত—কাঁচা তপ্ত রক্ত!

মুসলিম-লীগ সম্প্রদায় বলছে, লড়কে লেঙ্গে পাকিস্থান!

কংগ্রেসী দল বলছে, জয় হিন্দ।

যুগ পরিবর্ত্তনের সময় এলো নাকি? চরম সীমায় এসে পৌঁছেচে কি কলি যুগ? রক্ত-পাগল মত্ত মানুষের বুকের রক্তে রাঙা হয়ে উঠবে ধূসর ধরণী আর সেই রক্ত-ধৌত ধরণীর বুকের ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে নব-যুগ!

মহিম বললে, ব্যাপার তো কিছুই বোঝা যাচ্ছে না, জরিফ! কার বিরুদ্ধে এই 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম'?

জরিফ অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়লো। একটু পরে সুরু করলে, কি হিন্দু, কি মুসলমান—জনসাধারণ যদি রাজনীতি বুঝতো তাহলে তো আমাদের চিন্তার বা আলোচনার কিছুই থাকতো না। যাদের

আমরা "mass" বলি তাদের পিছনে চিরকালই থাকে—"Brain"! ঐ "Brain" করে তাদের কর্ম্ম পন্থা নির্দ্ধারণ। এ ক্ষেত্রেও ঘটছে ঠিক তাই। গুণ্ডামি, অগ্নিকাণ্ড, লুঠ-তরাজ যারা করে চলেছে তারা শুধু যন্ত্র মাত্র—যন্ত্রী আছেন তোমার আমার অলক্ষ্যে। যে ভাবে যন্ত্রী যন্ত্রকে চালনা করেন—যন্ত্র চলে ঠিক সেই ভাবে।

সিগারেটের ছাইটা আঙুলের টোকা মেরে ঝাড়তে ঝাড়তে টানা সুরে ব'লে চললো জরিফ, কিন্তু কোন সুস্থ মস্তিষ্কের লোক কি এ কথা কল্পনা করতে পারে যে—একটি সম্প্রদায় আর একটি সম্প্রদায়ের সব লোককে নিশ্চিহ্ন করে নিজেরা যত কিছু সুখ-সমৃদ্ধি ভোগ করবে? নিশ্চিহ্ন করা তো দূরে থাক—এই জন-জাগরণের দিনে কোন সম্প্রদায় কি আর-এক সম্প্রদায়ের ন্যায় সঙ্গত দাবী ঠেকিয়ে রাখতে পারে?—পাগল! এ যুগে কেউ কারও দাবী উপেক্ষা করে তাকে দাবিয়ে রাখতে পারে না। যুগ-ধর্ম্মী মানুষ বৃটিশ বেয়নেটের সামনে বুক পেতে দেয় শুধু ঐ দাবীর জন্য। তা ছাড়া যে কোন সাধারণ বুদ্ধির লোকের এ কথা বুঝতে বাকি নেই যে—এ সবই হচ্ছে তৃতীয় পক্ষের রাজনীতিক চাল। "Divide and rule"—এই সর্ব্বনাশা নীতির জোরে আধিপত্য বজায় রাখার অপচেষ্টা!

বেহারা দিয়ে গেল দু'খানি ডিসভর্ত্তি মামলেট আর পাঁপর ভাজা। আর চায়ের সরঞ্জাম।

—জানো সোফিয়া! খুব সম্ভবতঃ লীগপন্থী মুসলমান আর হিন্দুর মধ্যে একটা ভীষণ মারামারি বাধবে! বলে মহিম মামলেটের একটা টুকরো মুখে দিলে।

সোফিয়া নৈরাশ্যব্যঞ্জক সুরে বললে, এখনো বাধেনি?

সোফিয়ার কথা শুনে পাঁপর ভাজার টুকরোটা মুখেই রয়ে গেল

জরিফের, চিবুতে ভুলে গেল। বলে কি সোফিয়া! মারামারি বাধলে কি ও সুখী হবে!

—মনে হচ্ছে—এই বাধলো ব'লে! উত্তর দিলে মহিম।

—সুখবর নিশ্চয়! কি বলেন, মিয়াসাহেব? জরিফের উদ্দেশে বললে সোফিয়া।

—তার মানে?

—তার মানে হিন্দু-মুসলমানে একটা ভীষণ মারামারি, কাটাকাটি হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়!

—কি বলছো, সোফিয়া! প্রায় আঁতকে উঠলো মহিম।

সোফিয়া গাম্ভীর্য্যভরা কণ্ঠে বললে, বিশ্বাস কর, আমি ঠাট্টা কচ্ছি না। নিজেদের মধ্যে শক্তি পরীক্ষার একটা tug-of-war না হলে—আমরা আমাদের উভয় সম্প্রদায়ের মিলিত শক্তির আন্দাজ পাবো কেমন করে। অদূর ভবিষ্যতে এই মিলিত শক্তিই তো প্রয়োগ করতে হবে—তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে!

—বেগমসাহেবার রাজনৈতিক বুদ্ধির প্রশংসা করতে হয়, মহিম!

চায়ের পিয়ালায় চুমুক দিয়ে তৃপ্তির অস্ফুট শব্দ করে মহিম বললে, কেবলমাত্র গুণ্ডামি ছাড়া আর কিছু নাও ঘটতে পারে!

—তাতে সব চেয়ে বেশী খুসী হবো আমি আর দুঃখিত হবেন বেগমসাহেবা। বলে জরিফ সোফিয়ার দিকে চেয়ে হাসতে চেষ্টা করলে।

সোফিয়া নীরবে চা খেতে লাগলো।

চায়ের পিয়ালায় উপরি-উপরি বার কয়েক চুমুক দিয়ে জরিফ, বললে, মারামারি বাধলে সব চেয়ে মুস্কিল কাদের জানো মহিম? এই আমার মত জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের। যাকে বলে 'মারীচের

অবস্থা'—মৃত্যু অনিবার্য্য, হয় রামের হাতে মরণ আর নয় রাবণের হাতে।

—সেটা কি রকম? জিজ্ঞাসা করলে মহিম।

—এই সোজা কথাটা তুমি বুঝতে পারলে না কিন্তু বেগমসাহেবা বুঝেছেন নিশ্চয়। মুসলমান হিসাবে হিন্দুদের হাতে নিস্তার নেই, আর ওদিকে জাতীয়তাবাদী মুসলমান হিসাবে লীগপন্থীরা আমায় ছেড়ে কথা কইবে না। কি বলুন, বেগমসাহেবা?

—কথাটা মিয়াসাহেব মিথ্যা বলেন নি? মন্তব্য করলে সোফিয়া।

—সন্ধ্যা তো প্রায় হ'য়ে এলো। তুমি আজ আর নাই বা মেসে ফিরলে, জরিফ?

রহস্যভরা কণ্ঠে জরিফ বললে, তা হয় না দোস্ত। আজ যদি মেসে না ফিরি তাহলে ওরা আমার গোরের ব্যবস্থা করে স্বর্গে গিয়ে খবর নেবে, আর নয় হাসপাতালে ফোন করবে। ম'রে গিয়ে ব্যাচারীদের কষ্ট তো একবার দিতেই হবে, বেঁচে থেকে তার আগে আর বিব্রত করি কেন?

তাহলে আর দেরী না করে পত্রপাঠ তুমি এবার বিদায় হও। ভরসন্ধ্যাবেলা হিন্দুপল্লী দিয়ে আর হেঁটে গিয়ে কাজ নেই, চল আমিই তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসি। বলে মহিম আসন ছেড়ে উঠে পড়লো।

জরিফ বললে, উঁহু—বেগমসাহেবাকে এ সময় একা বাড়ীতে রেখে তোমার যাওয়া হতে পারে না, মহিম। তোমার সোফারকে বল—আমায় পৌঁছে দিক! আদাব বেগমসাহেবা, যদি বেঁচে থাকি—আবার দেখা হবে।

বন্ধু ও বান্ধবীর কাছে বিদায় নিয়ে জরিফ তার গোয়াবাগানের মেসে ফিরে গেল।

রাত তখন কটা কে জানে—টর্চের তীব্র আলো চোখের ওপর এসে পড়ায় চট্‌ করে জরিফের ঘুম ভেঙ্গে গেল। বিহ্বল জরিফের তন্দ্রাজড়িত কণ্ঠে ধ্বনিত হলো, কে! তাড়াতাড়ি জরিফ বিছানার ওপর উঠে বসলো। টর্চের আলো ঘুরে এসে পড়লো তার মুখ চোখের ওপর। লাফিয়ে উঠে ভয়ার্ত্ত জরিফ লাইটের সুইচ টিপে দিলে।

—ভয় নেই, আমি! নিজের জানলায় দাঁড়িয়ে বললে শ্যামলী।

দিশেহারা জরিফ বললে, এঁ্যা—!

ঘুরিয়ে টর্চের আলোটা নিজের মুখের ওপর ফেলে শ্যামলী বললে, আঃ ব্যাটাছেলে এমন ভীতুও হয়। বলছি—আমি!

—আমি একটা ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখছিলাম, শ্যামলী! তাই—তাই কেমন—

জরিফকে কথা শেষ করতে না দিয়ে শ্যামলী বললে, স্বপ্নের কথা পরে হবে! ব্যাপারটা আমি বড় ভাল বুঝছি না। কেমন যেন সব বেপরোয়া মারাত্মক মনোভাব। রাত প্রায় শেষ হ'য়ে এলো! ভোর না হ'তে হতেই আপনি এখান থেকে চলে যান!

—কেন?

—আঃ বেশী কথা বলবার সময় নেই। এখানে মানে এ হিন্দু-পল্লীতে থাকা আর এক মিনিটও আপনার পক্ষে নিরাপদ নয়। আমি যতদুর শুনেছি মুসলমানপ্রধান জায়গায় হিন্দুদের প্রায় শেষ করে দিয়েছে। এই হিন্দুপ্রধান জায়গায় মুসলমানদের হবে ঐ একই অবস্থা। প্রতিশোধ না নিয়ে এরা কিছুতেই ছাড়বে না। আভাসে বুঝলাম, সন্ধ্যা থেকেই এদের তোড়জোড় চলেছে! বলতে বলতে ভয়ে দুঃখে শ্যামলীর গলাটা ধরে এলো।

কি বলছো তুমি শ্যামলী! তোমরা এখানে নতুন এসেছে, কিন্তু আমি এ পাড়ায় আছি আজ প্রায় পনর বছর। পাড়ার প্রত্যেক

হিন্দুটি আমায় চেনে—খুব ভাল ভাবেই চেনে। শুধু চেনা নয়—সাহিত্যিক হিসাবে তারা আমায় যথেষ্ট খাতির করে। তা ছাড়া এতো দিনের চেনা পরিচয়, দয়া, মায়া, স্নেহ—না না এ কখনো সম্ভব নয়! জরিফ শ্যামলীর কথায় কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারলে না যে এ পাড়ার হিন্দুরা তার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারে।

ঝঙ্কৃত কণ্ঠে শ্যামলী বললে, কি মুস্কিল, মুসলমান গরিষ্ঠ স্থানে হিন্দু-মুসলমানে ঠিক এমনি ভাব-ভালবাসাই ছিল; কিন্তু চোখের পাতা ওল্টাতে তাদের বেশীক্ষণ সময় লাগেনি—এদেরও লাগবে না। তা ছাড়া এ পাড়ার লোক আপনাদের ক্ষমা করলেও অন্য পাড়ার লোক আপনাদের কিছুতেই ছেড়ে কথা কইবে না। দোহাই আপনার, কথা কাটাকাটি করে অযথা আর সময় নষ্ট করবেন না। ভোর হতে আর বেশী দেরী নেই, আপনি প্রস্তুত হোন।

—জাতীয়তাবাদী মুসলমান হিসাবে আমাকে তারা কিছুই বলবে না!

—জাতীয়তাবাদীর ছাপ আপনার কি বুকে পিঠে মারা আছে? মাথা মোটা গুণ্ডারা আপনার ও দোহাই মানবে না। আপনি যান—! শ্যামলীর মিনতি ভরা কণ্ঠে যেন আর্ত্তনাদের সুর ধ্বনিত হলো।

জরিফ বললে চিন্তান্বিত কণ্ঠে, কিন্তু এই ভোর রাত্রে আমি যাবোই বা কোথা! যাবার মত আমার তো স্থান নেই, শ্যামলী?

—আপনার জাত ভাই মানে মুসলমান গরিষ্ঠ এলাকায় ভোরের আলো দেখা দেয়ার আগে চলে যান। এখানে থাকলে আপনার বিপদ অনিবার্য্য!

নিরুপায় জরিফ বললে, আমার মাথায় তো কোন যুক্তি আসছে না, শ্যামলী!

—আমি কি আপনার পায়ে মাথা খুঁড়ে মরবো! উঃ মাগো—

হঠাৎ শ্যামলীর দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হলো। ঘাড় ফিরিয়ে ভয়ার্ত্ত চোখে চাইলে শ্যামলী। আবার ঝন্ ঝন্ করে কড়া নড়ে উঠলো। তাড়াতাড়ি জরিফের মুখের ওপর জানলাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে অশ্রুসজল চোখে শ্যামলী টলতে টলতে গিয়ে ঘরের খিল খুলে দিলে। বাবাকে সামনে দেখে ওর বুকের রক্ত জল হ'য়ে গেল, শুষ্ক কণ্ঠ দিয়ে একটা কথাও বেরিয়ে এলো না। হাতে-নাতে ধরা পড়া চোরের মত শ্যামলী কম্পিত কলেবরে একধারে সরে দাঁড়াল হেঁট মুণ্ডে।

—এতো রাত পর্য্যন্ত চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়লে কখনো শরীর টেঁকে —না বয়! ছিঃ মা—এ ভাবে কখনো স্বাস্থ্য নষ্ট করে? যাও, আলো নিবিয়ে দিয়ে চট্‌পট্ শুয়ে পড়। রাত যে প্রায় শেষ হয়ে এলো—সে খেয়াল আছে!

—আর পড়বো না বাবা, এখুনি শুয়ে পড়ছি! শুষ্ক কণ্ঠ যথাসম্ভব সরস করে বললে শ্যামলী।

—হ্যাঁ, শুয়ে পড়! কন্যার মাথায় স্নেহস্পর্শ বুলিয়ে ভদ্রলোক চলে গেলেন।

দরজা বন্ধ করে শ্যামলী আবার গিয়ে জানলার ধারে দাঁড়াল। টর্চ্চ ফেলে জরিফের ঘরখানা দেখে নিলে। বিছানা খালি, জরিফ ঘরে নেই। আশ্বস্ত হলো শ্যামলী। যাক, ভোরের আগেই জরিফ নিশ্চয় কোন না-কোন নিরাপদ স্থানে পৌঁছে যাবে। ঠিক সময়ে প্রেমাস্পদকে সাবধান করতে পারায় কৃতার্থ বোধ করলে শ্যামলী, মনের মধ্যে জাগলো আত্মপ্রসাদ! বেঁচে থাকলে একদিন-না-একদিন নিশ্চয় তার কাছে ফিরে আসবে জরিফ। জরিফ যে বেইমান নয়—এ প্রমাণ সে বহুভাবেই পেয়েছে।

ভোরের অস্পষ্ট আলো ছড়িয়ে পড়লো আশ-পাশে। একটি ক্ষুদ্র নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো শ্যামলীর বুক ঠেলে। ধীর, মন্থর পদে গিয়ে

সে খাটের ওপর লুটিয়ে পড়লো। হাজার চিন্তাকে দূরে সরিয়ে আরিফের মুখখানি ভেসে উঠলো তার চোখের সামনে। ঘুমিয়ে পড়লো শ্যামলী।

দিনের আলো ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা সহরময় স্থরু হ'য়ে গেল হত্যার তাণ্ডব-নর্ত্তন। সংক্রামক ব্যাধির মত হিংসার ছোঁয়াচ, রক্তের তৃষা জাগলো সহরের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে। হাজার হাজার নিরীহ নর-নারী কি অসহায় ভাবেই না মরণের কোলে ঢলে পড়লো! ঠেঙিয়ে ইঁদুর মারতে আমরা অনেকেই দেখেছি কিন্তু মানুষ মারতে দেখা গেল এই প্রথম। কুকুর, বেড়ালের মত করুণ আর্ত্তনাদে হাজার, হাজার হিন্দু-মুসলমান রাজপথের ওপর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলে। মৃত্যু যেন আজ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে জীবন্ত হ'য়ে নেমে এসেছে ধরণীর বুকে। তাকে বাধা দেবার, গতি তার রুদ্ধ করার সাধ্য আছে কার?

হিন্দুর হাতে মরছে নিরীহ মুসলমান আর মুসলমানের হাতে মরছে নিরীহ হিন্দু, আসল গুণ্ডাদের কিন্তু কেউ কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারছে না।

রক্ত-পাগল গুণ্ডার দল বুদ্ধি-বিবেচনার ধার ধারে না, যুক্তি বা বিচারের বালাই নেই ওদের কাছে। ফলে—হিন্দুর হাতে অগণিত হিন্দু দিলে প্রাণ আর মুসলমানের হাতে অসংখ্য মুসলমানও দিলে প্রাণ। যার ওপর সন্দেহ হলো—আর কথা নেই, খড়্গ নামলো তার গলায়, ছুরি বসলো তার বুকে।

ভয়ে হিন্দুর বর্ণশ্রেষ্ঠ বহু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বহুদিনের সযত্ন রক্ষিত দাড়ি কামিয়ে ফেললেন। বহু মুসলমান দাড়ি রেখে মাথায় ফেজ চড়ালেন।

ওস্তাদ হিন্দু-গুণ্ডা লুঙি পরে মাথায় টুপি চড়ালে কার্য্য সিদ্ধির জন্য, আর মুসলমান-গুণ্ডা দাড়ি কামিয়ে ধুতি পাঞ্জাবী পরে শিকারের সন্ধানে রাস্তায় বেরুলো। সুবিধাবাদী সম্প্রদায় রাতারাতি ভেক পালটে ফেললে!

বেতারের ঘোষণা অনুসারে পাড়া ছেড়ে কেউ আর সাহস করে বেপাড়ায় পা দিলে না। বাজার বন্ধ, দোকান-পাটের তালা বন্ধই রয়ে গেল। হিন্দু পাড়ায় মুসলমানের দোকান হলো নিশ্চিহ্ন আর মুসলমান পাড়ায় হিন্দুর হলোও একই সঙ্গীন অবস্থা।

হিন্দু-মহল্লায় মুসলমানদের উদ্ধারের জন্য এবং মুসলমান পাড়ায় হিন্দুর উদ্ধারের জন্য দিকে দিকে ছুটলো রিলিফে লরী।

একমাত্র রিলিফের লরী ছাড়া রাজপথে যান চলাচল একেবারে বন্ধ। ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি, রিক্সা—কা কস্য পরিবেদনা।

মালিক বিহীন ঘোড়া-মোষগুলো রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। রাজপথে জ্বলছে ঘোড়ার গাড়ী, ট্যাক্সি, রিক্সা, মোষের গাড়ী, প্রাইভেট মোটার এবং বাস।

অরাজকতা আর কাকে বলে! নেই নিয়ম, নেই শৃঙ্খলা। চতুর্দ্দিকে চলেছে স্বেচ্ছাচারী উন্মত্ত জনতার অবাধ রাজত্ব অত্যাচার, উৎপীড়ন, লুণ্ঠন, হত্যা! মানুষের প্রাণ নেওয়া যে এত সহজ, মানুষের প্রাণের যে তিলার্দ্ধও মূল্য নেই—এই মহান তথ্যটা মানুষ যেন হঠাৎই আবিষ্কার করে ফেললে।

গুণ্ডাদের এই অবাধ হত্যালীলা দমন করতে কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়লো ছাত্র সম্প্রদায়! "জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনা হীন!"

রক্তস্নাত দিনের হলো অবসান। এলো নেমে সন্ধ্যার আঁধার! নৈশ অভিযানের জন্য অথবা আত্মরক্ষার জন্য পাড়ায় পাড়ায় পড়লো

সাজ-সাজ রব। রক্ত-দীপালীর আলোকমালায় সজ্জিত করা হলো মহা-নগরীকে। মোড়ে মোড়ে বসলো পাহারা।

মুসলমান মহল্লা থেকে হাজার কণ্ঠে ধ্বনিত হয় [illegible]-হো-আকবর।" হিন্দু মহল্লা দেয় তার পাণ্টা জবাব—[illegible] মাতরম্।"

আক্রান্ত মহল্লায় বেজে ওঠে—শাঁক, ঘণ্টা, [illegible]।

সাঙ্কেতিক বংশীধ্বনি নৈশ-স্তব্ধতার [illegible] চিরে ছুটে যায় রাজপথে এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে।

নিদ্রাহারা নরনারী ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে [illegible], আতঙ্কিত ভাবে রাত্রির প্রতিটি প্রহর গণনা করে। [illegible] মুহূর্ত্তে মনে হয়—এই বুঝি জীবন্ত মৃত্যু রূপ ধরে নেমে এ[illegible] বুকে।

ষ্টেশনে ষ্টেশনে লোক আর ধরে না। [illegible] চায় মৃত্যুর হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে, আসন্ন মৃত্যুর কবল থেকে নিজেদের বাঁচাতে। মরণের মুখ থেকে ছুটে চলে যেতে চায় হাজার হাজার আর্ত্ত নরনারী দূরে—আরও দূরে!

প্রতিটি রাস্তা সমাকীর্ণ হ'য়ে উঠলো অগণিত শবদেহে, তাজা নর-মাংসের আস্বাদ পেয়ে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠলো রাস্তায় ঘোরা নেড়ী কুকুরের দল। শ্মশানবিহারী শকুনের দল শবদেহসমূহ ঘিরে রাজ-পথের ওপর মেলা বসিয়ে ফেললে। মানুষের [illegible]ংস নিয়ে লড়াই বাধলো কুকুর আর শকুনে।

সারা সহর হ'য়ে উঠলো প্রেতের লীলা নিকেতন, বিজাতীয় আতঙ্কে সন্ধ্যা না হ'তে হতেই খিল পড়লো সহরবাসীর সদর দরজায়।

পুরো দেড় দিন অর্থাৎ জরিফের সঙ্গে শেষ সাক্ষাতের প্রায় ছত্রিশ ঘণ্টা পর শ্যামলী মেসের দিকের জানলাটা খু[illegible]। যে ক'জন পালিয়ে বেঁচেছে সেই ক'জন ছাড়া মেসের একটি প্রাণীও বেঁচে নেই। কি মর্ম্মান্তিক ভাবেই না তাদের মেরে ফেলা হ'য়েছে! সে বীভৎস

দৃশ্য মনে পড়লে এখনো সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে! একদল মানুষ আর একদল মানুষকে নির্ব্বিবাদে মেরে ফেলছে। অপরাধ? তারা বিধর্ম্মী! হোক তারা নিরীহ, কি যায় আসে তাতে। ওদেরই জাত ভাই বিজাতী ও বিধর্ম্মী হিসাবে ভিন্ন দলীয় নিরীহের প্রাণ নিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করেছে—না করছে! চাই দাঁতের বদলে দাঁত, জীবনের বিনিময়ে জীবন। রক্তপাগল মানুষের বুকে আজ মায়া নেই, দয়া নেই, নেই মনুষ্যত্ব; বর্ব্বর যুগের সুপ্ত কামনা জেগেছে ওদের অন্তরে।

আসন্ন সন্ধ্যার আলো-আঁধারে জন-মানবশূন্য মেসবাড়ীটা একটা প্রেতপুরীর মত বীভৎস নীরবতা সম্বল করে দাঁড়িয়ে আছে। মানুষের বুকের কাঁচা তপ্ত রক্ত ঐ প্রেত-মহলের প্রতিটি ঘরের মেঝেয় জমাট বেঁধে ঠাণ্ডা হ'য়ে গেছে। ছুরিকা-বিদ্ধ বুকের তাজা রক্ত ফোয়ারার মত ফিনিক দিয়ে ছিটকে পড়ছে প্রতিটি দেয়ালে।

আতঙ্কে শ্যামলীর ক্ষুদ্র বুকখানি আবার নতুন করে কেঁপে উঠলো। মনে পড়লো জরিফের মুখখানি। উঃ ভাগ্যিস সে এখান থেকে ঠিক সময়ে চলে গিয়েছিল, নইলে—নইলে—আর ভাবতে পারে না শ্যামলী, জানলার গরাদ দুটো শক্ত করে ধরে দাঁড়ায়—ক্ষণেকের জন্য চোখ দুটো তার আপনি বুজে আসে।

শিষ দেওয়ার একটা ক্ষীণ আওয়াজ তার কানে এলো। তন্ময় শ্যামলী বিহ্বল নেত্রে মেসের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলো, আবার ঐ শিষের আওয়াজ তার কানে এলো। কি রকম—, শিষটা যেন ঐ মেসবাড়ীর দিক থেকেই আসছে নয়! কান পেতে মেসের দিকে চেয়ে রইলো শ্যামলী, আবার—আবার ঐ শিষ! ভয়ে বুকটা কেঁপে উঠলো শ্যামলীর, কেমন একটা অজানিত আতঙ্কে তাড়াতাড়ি সে জানলাটা বন্ধ করতে যাচ্ছিল—হঠাৎ পরিচিত, একান্ত আকাঙ্ক্ষিত করুণ কণ্ঠের আকুল ডাক এলো, শ্যামলী!

কার—কার এ কণ্ঠস্বর! দ্বিধাজড়িত মনে ক্ষণেক স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো শ্যামলী। সে কি ভুল শুনলে! নিশ্চয় এ তার মনের ভ্রম! আধ ভেজোনা জানলা বন্ধ করবার ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে আর্ত্তের আর্ত্তনাদের মত স্পষ্ট তার কানে এলো ঐ মেসেরই দিক থেকে —শ্যামলী!

এ যে জরিফের কণ্ঠস্বর! সাহসে ভর করে জানলা খুলে শ্যামলী সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে কি যেন বলতে গেল, কিন্তু কিছু বলবার আগেই সঙ্কেতসূচক একখানি হাত বেরিয়ে এলো ঐ মেসবাড়ীরই বাথ-রুমের উঁচু ছোট্ট জানলাটির ভিতর দিয়ে,—আমি—আমি জরিফ!

—জরিফ! আতঙ্ক মিশ্রিত আনন্দে আত্মহারা শ্যামলী স্থান, কাল সব ভুলে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো।

মুখটা ঐ ছোট্ট জানলাটার ধারে এগিয়ে এনে জরিফ বললে, আমি আজও বেঁচে আছি, শ্যামলী!

অন্ধকারে জরিফকে দেখা গেল না। তা নাই যাক, কিন্তু সে যে জরিফ—সে বিষয়ে তো আর কোন সন্দেহ নেই। চাপা গলায় শ্যামলী বললে, বেশী কথা বলবেন না, চুপ! আমি এখুনি যাচ্ছি!

মেস আর শ্যামলীদের বাড়ীর মাঝখানের এই একান্ত সরুগলিটা 'ব্লকড্ লেন'। আবর্জ্জনা ও ইট-কাঠের টুকরোয় ভর্ত্তি। পারত পক্ষে এখানে দিনের বেলাতেও কেউ ঢোকে না। শ্যামলীদের বাড়ীর পিছনে একটা ছোট্ট দরজা আছে। এটা কালে-ভদ্রে খোলা হয়। অতি সন্তর্পণে এই দরজাটা খুলে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলো শ্যামলী। মেথর যাতায়াতের জন্য মেসের বাড়ীর পিছনে এক হারা একটা দরজা আছে। এই দরজাটা ভেঙে দুর্ব্বৃত্তরা গতকাল ভোরে এই বাড়ীতে ঢুকেছিল। এই ভাঙা দরজা দিয়ে মেসবাড়ীর মধ্যে ঢুকলো শ্যামলী।

পাছে কেউ দেখতে পায় এই ভয়ে সে এতক্ষণ টর্চ্চ জ্বালেনি, এইবার জ্বাললো।

এতক্ষণ যে বাড়ীখানাকে সে প্রেতের আবাসস্থল কল্পনা করে নিজের ঘরের জানলায় দাঁড়িয়ে প্রতি মুহূর্তে আতঙ্কে শিউরে উঠছিল, সেই বাড়ীখানায় বর্ত্তমানে ঢুকতে তার বিন্দুমাত্র ভয় হলো না। জীবন্ত জরিফের অস্তিত্ব এই বাড়ীর সব কিছু ভয় শ্যামলীর মন থেকে নিঃশেষে মুছে দিয়েছে। কোমরে কাপড় জড়িয়ে টর্চ্চ হাতে নিয়ে বিজয়িনীর মত চলেছে শ্যামলী তার প্রিয়তমকে উদ্ধার করতে, মরণের মুখ থেকে ফিরিয়ে আনতে। ভয় তার অন্তর থেকে ভয় পেয়ে পালিয়ে গেছে বললেও অত্যুক্তি হয় না। চোখে মুখে শ্যামলীর ফুটে উঠেছে একটা উজ্জ্বল দীপ্তি, প্রলয়ের ঝঞ্ঝাবাত এড়িয়ে সে ফিরে পেয়েছে একান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে তার প্রেমাস্পদকে। খুসীর লাবণ্য উছলে উঠেছে শ্যামলীর চোখে, মুখে, সর্ব্বাঙ্গে।

ক্ষুদ্র চত্বর পেরিয়ে সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়াল শ্যামলী। টর্চ্চ ঘুরিয়ে চারিধারটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিলে। এই সন্ধ্যাবেলাতেই পাথরের মত জমাট বাঁধা হিম শীতল বিরাট নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে বাড়ীখানার সর্ব্বত্র। বিরাট হত্যাকাণ্ডের মূক সাক্ষী হ'য়ে পলকবিহীন নেত্রে চেয়ে আছে এর প্রতিটি জানলা, দরজা, ইট, কাঠ, পাথর!

সিঁড়ির কয়েক ধাপ উঠেই অকথ্য আতঙ্কে চমকে উঠলো শ্যামলী। অনিচ্ছাসত্ত্বেও তার কণ্ঠ ফুঁড়ে বেরিয়ে এলো অস্ফুট ভয়ার্ত্ত ক্ষীণ আর্ত্তনাদ। একটা মৃতদেহ কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছে সিঁড়ির বাঁকের মুখে। কালো জমাট-বাঁধা রক্তে মুখ, চোখ তার ঢেকে গেছে।

শ্যামলী প্রায় ছুটে দোতলায় উঠে এলো। একটি মৃতদেহ এড়াতে গিয়ে সে আচম্বিতে পাঁচ সাতটি মৃতদেহের মাঝখানে এসে পড়লো।

বীভৎস মূর্ত্তি নিয়ে মৃতদেহগুলি ছড়িয়া আছে দোতলার গোটা বারান্দা জুড়ে। মাথাটা ঘুরে গেল শ্যামলীর, আর সে পারে না নিজেকে ঠিক রাখতে। দেয়ালটা ধরে আসন্ন পতন থেকে সে নিজেকে রক্ষা করলে। এ সময় মাথার ঠিক না রাখতে পারলে, বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্যে কি ভয়ঙ্কর, বীভৎসকাণ্ডই না ঘটে যাবে। শমনের দল ঘুরে বেড়াচ্ছে আনাচে কানাচে, বিন্দুমাত্র সন্দেহ ওদের মনে জাগলে আর কি রক্ষা আছে!

ইচ্ছা হলো—সব আলোগুলো বাড়ীর জেলে দেয় শ্যামলী! জমাট-বাঁধা অন্ধকারে তার নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হ'য়ে আসছে। চারদিক থেকে কারা যেন তাকে গিলতে আসে।

—না—না, আলো জ্বালা হ'বে না—তাতে অপঘাতে মৃত ঐ মানুষগুলো স্পষ্ট হ'য়ে উঠবে তার চোখের সামনে! সে দৃশ্য অসহনীয়। তা ছাড়া নির্জ্জন পুরীতে আলোর রেখা যে শয়তানদের মনে সন্দেহের ছায়াপাত করবে! আলো কিছুতে জ্বালা হবে না, শ্যামলীর প্রাণ যদি এতে বেরিয়ে যায় তাও স্বীকার।

এখনো আর এক তলা সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হবে শ্যামলীকে। তিন তলায় থাকে জরিফ, বাথ-রুমটাও তারই ঘরের পাশে। এরই মধ্যে বুক ধড়ফড় কচ্ছে তার, হাঁফ ধরে গেছে. এখনো অতগুলো সিঁড়ি সে ভাঙবে কেমন করে!

দেয়ালে ভর দিয়ে টর্চ্চ সামনে ধরে উঠতে সুরু করলে শ্যামলী। বেশী দূর উঠতে হলো না, একটি মৃতদেহ সিঁড়ির ওপর লম্বা হ'য়ে পড়ে আছে। চিন্তার মত নেই মানসিক অবস্থা, নেই অবসর! চোখ বুজিয়ে লাফ দিয়ে দুধাপ ওপরে উঠে এলো শ্যামলী। তারপর কেমন করে যে সে তিন তলায় পৌঁছে গেল তা সে নিজেই বুঝতে পারলে না।

আর দম নেবার সময় নেই। জরিফ বেঁচে আছে কিন্তু সে দু'দিন অভুক্ত! শ্যামলী ক্ষিপ্রপদে জরিফের ঘরে গিয়ে ঢুকলো। না—, ভয়ে সে বাথ-রুম থেকে এখনো বেরিয়ে আসেনি।

বাথ-রুমের সামনে গিয়ে দাঁড়াল শ্যামলী। দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। অতি সন্তর্পণে দরজায় টোকা দিয়ে শ্যামলী বললে, দরজা খুলুন। আমি!

দরজার পাশে ছোট ঘুলঘুলিটার ভিতর থেকে আওয়াজ এলো, কে—শ্যামলী!

--হ্যাঁ—হ্যাঁ, আমি। শীগ্‌গীর দরজা খুলুন।

অতি সন্তর্পণে দরজা খুলে বেরিয়ে এলো জরিফ। এই দেড় দিনে চেহারা তার আধখানা হ'য়ে গেছে। দেড় দিনের প্রতিটি মুহূর্ত্ত সে কাটিয়েছে। এরই মধ্যে যেন তার দশ বছর বয়স বেড়ে গেছে। চোখ কোঠরে ঢুকেছে, গালের মাংস গেছে বসে, মাথায় রুক্ষু চুলের রাশ,—দেখলে সত্যিই ভয় হয় জরিফকে। সে নিজেই যেন একটা জীবন্ত প্রেতমূর্ত্তি।

দাঁড়াবার ক্ষমতাটুকু পর্য্যন্ত হারিয়ে ফেলেছে জরিফ। অতি কষ্টে সে শ্যামলীর কাঁধের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াল। শ্যামলীর কানের কাছে মুখ নিয়ে চাপা গলায় বললে, তোমার বুকটা অমন কাঁপছে কেন শ্যামলী! এ বাড়ীতে ঢুকতে তোমাকে কেউ দেখেনি তো?

—আপনার ঘরে চলুন! কোন ভয় নেই আপনার! বলে শ্যামলী জরিফকে নিয়ে তার ঘরে ঢুকে দরজায় খিল দিলে।

জরিফ বিছানার ওপর সটান লম্বা হ'য়ে শুয়ে পড়লো। শ্যামলী তার শিয়রে বসে চুলের ভিতর আঙুল বোলাতে বোলাতে বললে, খালি পেটে জল খেলে গা গুলোবে। তার আগে এই কলা আর পেঁপে টুকরো কটা খেয়ে নিন!

আপত্তি করলে না জরিফ। শ্যামলী একটির পর একটি টুকরো ওর মুখে দিয়ে দিতে লাগলো।

—এবার একটু জল দাও, শ্যামলী!

—দিচ্ছি, এই সন্দেশটা খেয়ে নিন!

জরিফকে সন্দেশ খাইয়ে শ্যামলী কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে আনতে গেল। কোথা জল! কুঁজোটা টুক্‌রো টুক্‌রো হ'য়ে মেঝের বুকে ছড়িয়ে পড়ে আছে। জলের সন্ধানে টর্চ্চ নিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকলো শ্যামলী। কিন্তু সেখানে যে বীভৎস দৃশ্য তার চোখে পড়লো তাতে জল সংগ্রহের কথা সে ভুলে গেল। সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় জবাই করা একটা লোক চীৎপাত হ'য়ে পড়ে আছে।

কঁপেতে কাঁপতে ফিরে এলো শ্যামলী।

চোখ বুজিয়েই জরিফ বললে, উঃ জল পেয়েছো, শ্যামলী?

জরিফের কানের কাছে মুখ নিয়ে শ্যামলী বললে, চলুন—এখুনি আমরা এখান থেকে পালিয়ে যাই।

—কেন—ওরা—ওরা কি সব টের পেয়েছে? কাঁপতে কাঁপতে উঠে বসলো জরিফ।

—না।

—তবে?

জরিফকে দু' হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে শ্যামলী বললে কম্পিতকণ্ঠে, আমি—আমি আর এক দণ্ডও এখানে থাকতে পাচ্ছি না।

—তাঃ কি হ'য়েছে বলবে তো?

জরিফের বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে বললে শ্যামলী, আপনি বুঝতে পাচ্ছেন না, এখানে থাকলে আমি পাগল হ'য়ে যাবো।

—কি মুস্কিল! ভেঙে তো ব্যাপারটা বলবে?

এক হাতে জরিফের গলাটা জড়িয়ে ধরে, অন্য হাতে দরজার

বাইরেটা দেখিয়ে শ্যামলী বললে, চারিদিকে মড়া পড়ে আছে। উঃ কি বীভৎস সব দেখতে!

—চোখ চাও শ্যামলী! ভয় আপাততঃ ওদের নয়। জীবন্ত ভূতের হাত থেকে আমাকে কেমন করে বাঁচাবে—এখন তাই ভাবো। এ সময় তুমি যদি ভেঙে পড় তাহলে জানবে আমার মৃত্যু অনিবার্য্য।

শ্যামলী সোজা হ'য়ে উঠে বসলো। জরিফ শক্ত করে ওর একখানা হাত চেপে ধরলে সাহস দেবার জন্য।

—আজ রাত্রে এখানে আপনার থাকা হবে না।

—মরার চেয়ে কি মড়ার সঙ্গে থাকা বাঞ্ছনীয় নয়, শ্যামলী?

—আপনি সে সব দৃশ্য চোখে দেখেননি। দেখলে আর এক মুহূর্ত্তও এখানে থাকতে চাইতেন না।

—কিন্তু এই সোজা কথাটা তুমি কেন বুঝতে পাচ্ছো না শ্যামলী—বাইরে বেরোনা মানেই তো এখন আমার মৃত্যু! মৃতদেহ আঁকড়ে তুমি আমায় বেঁচে থাকতে দেখতে চাও—না আমার মৃত্যু দেখতে চাও? শমন যে সব আশপাশেই ঘুরে বেড়াচ্ছে!

ক্ষণেক স্তব্ধ হ'য়ে কি যেন ভাবলে শ্যামলী। বললে, আজ রাত্রের মত আমাদের বাড়ীর নীচেকার একটা ঘরে আপনাকে লুকিয়ে রাখবো। তারপর সারারাত দু'জনে ভেবে আপনার পালাবার একটা উপায় ঠিক করা যাবে। আমি বেঁচে থাকতে আমাদের বাড়ীতে—যদি জানা-জানিও হয়, কেউ আপনার ছায়াটি পর্য্যন্ত মাড়াতে পারবে না। চলুন—!

আর দ্বিরুক্তি করলে না জরিফ। সে টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল। শ্যামলী ওর হাত ধরে টর্চ্চ জ্বালতে জ্বালতে নীচে নেমে এলো।

গলির ওপর নেমে অস্পষ্ট কণ্ঠে জরিফ বললে, উঃ বীভৎস দৃশ্যই বটে।

—চুপ! আমার হাত ধরুন।

জরিফকে নিয়ে নিজেদের বাড়ীর মধ্যে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ-সাতজন লোক ছুটে এলো গলির মধ্যে হল্লা করতে করতে। শ্যামলী ক্ষিপ্র হস্তে দরজায় খিল দিলে। পাশের ছোট্ট ঘরখানার মধ্যে জরিফকে নিয়ে ঢুকতে ঢুকতে আগন্তুকদের তাণ্ডব চীৎকার সুরু হ'য়ে গেল।

—এইখানে—ঠিক এইখানটা বরাবর আমি আলো দেখতে পেয়েছি। মনে হলো—কারা যেন এই বাড়ীর মধ্যে ঢুকলো!

—ধ্যেৎ শালা! তোর মনের ভুল, মেসবাড়ীর কি আর এক শালাকেও রেখেছি!

—মেসবাড়ী—মেসবাড়ী নয়. এই এদের বাড়ী! বললে খড়্গাধারী এক জীবন্ত যমন শ্যামলীদের বাড়ীর উদ্দেশ্যে।

—ডাক তবে এই বাড়ীর লোককে!

অসাবধানতাবশতঃ টর্চ্চের বোতামটা একবার সরে গিয়েছিল। তা থেকে এই বিপত্তি। এ সময় ওরা যদি চীৎকার করে পাড়া মাথায় করে তাহলে শ্যামলীর বাবা, চাকর-বাকর, বাড়ী শুদ্ধ লোক এখানে এসে জড় হবে। ফলে—জরিফকে ঐ যমনদের কবল থেকে হয়তো নাও বাঁচানো যেতে পারে।

জরিফকে একটা কোণে ঠেলে দিয়ে শ্যামলী ত্রস্তে জানলাটা খুলে দিয়ে বললে, আমি—আমি টর্চ্চ ফেলেছিলুম। টর্চ্চ ফেলে দেখছিলুম যে গলির মধ্যে কেউ লুকিয়ে-টুকিয়ে আছে নাকি!

—দেখেছিস শালা, আমার চোখকে ফাঁকি দেওয়া বড় শক্ত।

—ঠিক করেছেন আপনি। মাঝে মাঝে টর্চ্চ ফেলে গলিটা দেখে নেবেন! বলা যায় না, কোন্ শালা কোথা থেকে এসে ঘাপটি মেরে কখন লুকিয়ে বসে থাকবে।

—চল, ঘাঁটি ছেড়ে সবার একদিকে আসা ঠিক নয়।

—আচ্ছা, ও বাড়ীর মড়াগুলো সব আপনারা বড় রাস্তায় ফেলে দিয়েছেন তো? একান্ত ভাল মানুষের মত জিজ্ঞাসা করলে শ্যামলী।

—হ্যাঁ, অত শালাকে মারার খরচ কে দেয় তার ঠিক নেই, আবার বয়ে নিয়ে গিয়ে বড় রাস্তায় ফেলে আসি। চল—সব চল, শিকার হাত ছাড়া হ'য়ে যাবে। ছোরাধারী এই জলপাতার সিপাইটিই বোধ হচ্ছে দলপতি।

—আপনারা বুঝতে পাচ্ছেন না। ঐ বাড়ীতে অতগুলি মৃতদেহ পেলে পুলিশ আমাদের পাড়া একবারে তোলপাড় করে ছেড়ে দেবে। অন্ততঃ পুলিশের চোখে ধুলো দেবার জন্যও ও কাজটা আপনাদের করা উচিত! অসীম সাহসে ভর করে কম্পিতকণ্ঠে বললে শ্যামলী।

—কথাটা নেহাৎ মন্দ বলেন নি।

জড়িতকণ্ঠে দলের মধ্যে একজন মন্তব্য করলে, মেয়েছেলে হলে কি হয়—মাথা আছে।

—এই ব্যাটা মাতলামো করিসনি! আপনি ঠিকই বলেছেন, অন্ততঃ আমাদের বাঁচবার জন্যে ও কষ্টটুকু আমাদের স্বীকার করতেই হবে।

—চল, সব শালার ঠ্যাঙ ধরে বড় রাস্তায় দিয়ে আসি।

হুড়মুড় করে যমনের দল মেসবাড়ীর মধ্যে ঢুকতে যাচ্ছিল। দলপতি বললেন, এত সন্ধ্যে-সন্ধ্যে নয়। রাত দুপুরে কাজ সাফাই করতে হবে।

মদ্যপায়ী যমনটি শ্যামলীর জানলার দিকে নিমীলিত নেত্রে চেয়ে বললে, মড়া পচলে নিজেদের বাড়ীতে দুর্গন্ধে টি'কে থাকতে পারবে

না তাই এই সদ্‌যুক্তি। একটা বোতলের দাম কেউ চট্‌ করে বার কর্‌তে চায় না—পাড়া রক্ষে কর! আমাদের ভালো সব্বাই দেখে—হু!

রাত তখন বারোটা বা তারও বেশী।

সমনের দল চুপি সাড়ে এসে গলির মধ্যে ঢুকলো।

চাপা গলায় ওদেরি মধ্যে একজন বললে, খুব সাবধান! শালা সোলজাররা লরী থেকে নেমে বন্দুক উঁচিয়ে গলি-ঘুঁজি আনাচে-কাণাচে ঘুরছে। একটু টের পেলে আর রক্ষে নেই, সঙ্গে সঙ্গে গুড়ুম! কারফিউ কি যে সে জিনিষ!

—ওসব কারফিউ-টারফিউকে আমি বড় থোড়াই কেয়ার করি! জয় মা কালী বলে দেবো এই খাঁড়ার এক ঘা বসিয়ে—ব্যস, কুপোকাত! শালা সৈন্ত্রিকের পোর ধড়টা পূব দিকে আর গদ্দানটা পশ্চিম দিকে! জয় মা কালী!

—ছাখ শালা নফরা, ফের যদি মাতলামি করবি তাহলে দেবো এই ছোরা—শালা তোরি বুকে বসিয়ে!

মত্ত শয়তানটি অত্যধিক নেশার ঘোরে কেঁদে ফেললে। উচ্ছ্বসিত আবেগে বললে, কি—কি বললি, তুই শালা আমার বুকে ছোরা বসাবি? উঃ তোর সঙ্গে নয় আমার এ্যাদিনের দোস্তি! সব—সব ভুলে গেলি! সেই তুই,—তুই শালা চাস আমার বুকে ছুরি বসাতে! নাঃ এ প্রাণ—এ শালার প্রাণ আমার থাকার চেয়ে না থাকাই ভালো। তবে তোর হাতে মরার চাইতে আমার নিজের হাতে মরবো! জয় মা কালী!

তাড়াতাড়ি ওরা ধরে না ফেললে নফরা নিজের গলাতেই নিজে খাঁড়া বসিয়ে দিতো!

—শালা আজ ভয়ানক টেনেছে! বলতে বলতে নফরার দোস্ত তাকে টেনে নিয়ে মেসবাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়লো।

তারপর সুরু হলো লাস সরানোর পালা। এক একটা লাস ওরা টানতে টানতে বড় রাস্তায় নিয়ে গিয়ে ফেলে আসতে লাগলো। কিন্তু ব্যাপারটা সত্যিই তো সোজা নয়। রাস্তায় পা বাড়ানো মানেই মৃত্যুকে বরণ করে নেওয়া। সশস্ত্র সৈনিকরা যমদুতের মত কড়া পাহারা দিচ্ছে।

এরাও ধূর্ত্ত হিসাবে কমতি নয়। দু' মোড়ে জন হুইসিলদার গোপনে টহল দিচ্ছে। সৈনিকদের লরী এলাখা পেরিয়ে দূরে গিয়ে পড়লে ওরা সাঙ্কেতিক শব্দ করে। সেই হুইসিল শুনে এরা মড়া টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে যথা স্থানে ফেলে দেয়।

—উঃ শালা কি ভারী হে! মরে ফুলে গিয়ে যেন তিন গুণ ভারী হয়েছে। ধর ভাই—এই ঠ্যাঙটা ধর! ব’লে জনৈক সমন বন্ধুর সাহায্য প্রার্থনা করলে।

—মানুষ মারা যত সহজ—পাচার করা তত সহজ নয়। ছাড় বে —আমি একাই শালাকে বড় রাস্তা সই করে আসছি।

মেসবাড়ীর শুধু মড়াই ওরা সাফ করেনি, সারা বাড়ীখানা জল দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার, চকচকে করে ফেলেছে। তবুও ভোরের অস্পষ্ট আলোয় শ্যামলীদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে মেসবাড়ীতে ঢুকতে গাটা ছম্ ছম্ করে উঠলো জরিফের। কিন্তু প্রাণের মায়ার কাছে ভয় চিরদিন পরাজিত, আজও তার ব্যতিক্রম হলো না। দ্বিধা জড়িত মনে জরিফ নিজের ঘরে গিয়ে খিল দিলে।

জরিফকে বিদায় দিয়ে শ্যামলী আগেই এসে নিজের জানলায় দাঁড়িয়েছিল। জরিফও তার জানলার ধারে এসে দাঁড়াল। পরস্পর

পরস্পরের দিকে নীরবে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলো। সারারাত কথা বলেও তাদের কথা শেষ হয়নি! দু'জনের চোখই অশ্রুসজল, হৃদয় ভারাক্রান্ত, রক্তশূন্য মুখের ওপর ঘন বিষাদের কালিমা-প্রলেপ!

শ্যামলী ইঙ্গিতে জরিফকে বিছানায় গিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করতে বলে নিজে জানলা থেকে সরে গেল। যেতে প্রাণ তার চাইছিল না, তবুও সে গেল!

শ্যামলীর খেয়াল হলো—সে আজ দুপুরে নিজের ঘরে খাবে। ঠাকুর ওপরে ভাত দিয়ে গেল। শ্যামলী বললে, ঠাকুর! বুড়ো মানুষ তুমি, আমার জন্যে আজ আর বার বার ওপরে আসতে হবে না। যা দেবার—বরং একটু বেশী করে একেবারে দিয়ে যাও!

বুড়ো বামুনঠাকুর দিদিমণির এ হেন সহৃদয়তায় বেঁচে গেল। বার বার সিঁড়ি ভেঙে ওপর নীচ করা কি পোষায়! ভাত থেকে তরি-তরকারি, মাছ—সব কিছুই সে বেশী বেশী করে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে গেল।

ঝি সকড়ি নিতে এসে ফিরে গেল। শ্যামলী বললে, তোমরা সব খেয়ে নাও গে। আমার খেতে আজ একটু দেরীই হবে। বৈকালে সকড়ি নিও!

বেলা দুপুরের দিকে গড়িয়ে পড়লো। বাড়ীর পরিজনবর্গ আহারাদি সেরে দিবানিদ্রার কোলে আশ্রয় নিলে। শ্যামলী টিফিন-কেরিয়ার ভিতর ভাত, তরকারী, মাছ ইত্যাদি নিয়ে অতি সন্তর্পণে ওপর থেকে নেমে এলো, বাড়ী থেকে বেরোবার আগে বেশ করে চারদিক দেখে নিলে—ভিতর এবং বার। তারপর চোরের মত চুপি সাড়ে গিয়ে ঢুকলো মেসবাড়ীতে।

সটান ওপরে উঠে গিয়ে জরিফের ঘরের দরজায় আস্তে আস্তে ধাক্কা দিলে। জরিফ তখন ঘুমে অচৈতন্য, সাড়াই বা দেয় কে আর

দরজাই বা খোলে কে! মুস্কিলে পড়লো শ্যামলী। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পায়ে তার ব্যথা ধরে গেল। জরিফের ঘুম আর কিছুতে ভাঙে না। যাই হোক, ধাক্কা-ধাক্কি করতে করতে এক সময় জরিফের ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভাঙলে কি হয়—চট্ করে দরজা খুলতে জরিফের সাহস হয় না। সে শ্যামলীর সাড়া নিয়ে তবে দরজা খুললে! শ্যামলীর সব রাগ-তাপ এক লহমায় যেন জল হয়ে গেল, জরিফের মুখের দিকে চেয়ে সে হেসে ফেললে। দু'জনে ঘরের ভিতর গিয়ে দরজায় খিল দিলে।

টিফিন কেরিয়ার খুলে ধরে শ্যামলী বললে, থালা-টালা নেই, এমনিই খেতে হবে কষ্ট করে!

স্মিত হাস্যে জরিফ বললে, তা না হয় করলুম কিন্তু তুমি কি খাবে?

—তার মানে?

তার মানে তুমি না খেয়ে তোমার ভাগের ভাতটা আমার জন্যে লুকিয়ে নিয়ে এসেছো। এনেছো বেশ করেছো—নইলে আমি কি খেয়ে বাঁচবো! কিন্তু আমার সঙ্গে সঙ্গে তোমাকেও তো বাঁচতে হবে! তুমি যদি না বাঁচো তাহলে আমায় বাঁচাবে কে? শ্যামলীকে পাশে বসিয়ে তার দুটি হাত নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে সপ্রেমে বললে জরিফ।

শ্যামলী নীরব ভাষায় চেয়ে রইলো ওর মুখের দিকে। চোখ দিয়ে ফোঁটার পর ফোঁটা অশ্রু শ্যামলীর গাল বেয়ে ঝরে পড়লো জরিফের হাতের ওপর। কোঁচার খুঁট দিয়ে জরিফ ওর চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে মাথাটা বুকের ওপর টেনে নিয়ে নীরবে ওর মাথায় হাত বুলোতে লাগলো।

হঠাৎ যেন তন্দ্রা ভেঙে গেল শ্যামলীর, নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে

বললে, খিদে পায় না বুঝি! কখন খাবেন? বেলা কি আর আছে!

তুমি কাছে থাকলে খিদে-তেষ্টা আমার কিছুই থাকে না, শ্যামলী! মরণের তীরে দাঁড়িয়েও ভুলে যাই মৃত্যু ভয়! বলতে বলতে একটি ক্ষুদ্র নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো জরিফের বুক ঠেলে।

—কবিত্ব রাখুন! খেতে বসুন দেখি।

—তুমিও আমার সঙ্গে খাবে তো—না এখনো জাতের ভয় আছে?

—মেয়েদের জাত অত ঠুন্‌কো নয়, আমাদের পাকা জাত!

হাসিমুখে দুজনে খেতে বসলো।

রাত একটু বেশী হলে শ্যামলী অতি সন্তর্পণে মেসে এসে উঠলো। জরিফ আলো না জ্বালিয়ে ঘরের মধ্যে চুপ করে শুয়েছিল। শ্যামলীর ডাকে তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুলে দিলে। শ্যামলী দরজায় খিল দিয়ে জরিফের বিছানায় এসে বসলো, বুকের দ্রুত স্পন্দন তখনও তার স্বাভাবিক হয়নি।

—কি খবর, মেমসাহেব? বললে শ্যামলীর একটি হাত নিজের বুকের ওপর নিয়ে।

—আজ রাত্রেও আপনার এখানে থাকা হবে না। প্রথমতঃ ভয়ে আপনার সারারাত ঘুম হবে না, দ্বিতীয়তঃ গুণ্ডার দল খেয়ালের বশে হয়তো আজ রাত্রেও এ বাড়ীতে হানা দিতে পারে। লুটপাট করতে যা বাকি আছে তা হয়তো আজ নিয়ে যেতে আসবে। ঘরের দরজা বন্ধ দেখলে নিশ্চয়ই ওদের মনে সন্দেহ জাগবে। একবার সন্দেহ জাগলে আর উপায় নেই! তার চেয়ে আমাদের বাড়ী চলুন, আজকের মত কাল ভোরে আপনাকে বার ক'রে দেবো!

—আমার জন্যে সারারাত তুমি জেগে থাকবে? রাতের পর রাত এমনি ভাবে জাগলে হঠাৎ যদি অসুখে পড়, তখন?

—আঃ বড্ড বাজে বকেন আপনি! সারারাত জাগবো কেন শোবার আগে ঘড়িতে এ্যালার্ম দিয়ে শোব। ঠিক সময় নীচে নেমে এসে আপনাকে জাগিয়ে দেবো। চলুন! আমার হয়তো খোঁজ পড়তে পারে? বলে শ্যামলী উঠে দাঁড়িয়ে জরিফের হাত ধরে টান দিলে।

—কিন্তু এভাবে তুমি আর কতদিন আমায় লুকিয়ে রাখবে, শ্যামলী?

মৃদু ঝঙ্কারে শ্যামলী বললে, আচ্ছা, সে ভাবনা আমার।

—নাঃ মৃত্যু আমার কেউ রদ্ করতে পারবে না, শ্যামলী! বৃথাই তোমার এই আপ্রাণ চেষ্টা! বলতে বলতে ভারী হয়ে উঠলো জরিফের খেদাক্ত কণ্ঠ।

হতাশ হয়ে বসে পড়লো শ্যামলী জরিফের বিছানার ওপর। বললে, মেয়েদের মত এত অল্পে আপনি ভেঙে পড়েন—যার কোন মানে হয় না। আপনার মরণ বাঁচনের ভার আমি যখন নিজের হাতে নিয়েছি তখন আপনার মাথা ঘামাবার কি আছে? না কি আমি হিন্দুর মেয়ে ব'লে আমার ওপর ঠিক বিশ্বাস রাখতে পাচ্ছেন না!

বাধা দিয়ে জরিফ বললে, ছিঃ কি বলছো তুমি, শ্যামলী! হ'তে পারে তুমি হিন্দুর মেয়ে—, কিন্তু হিন্দুর মেয়ের প্রেম আর মুসলমানের মেয়ের প্রেম তো আলাদা নয়, শ্যামলী! প্রেম যে সব কিছুরই উর্দ্ধে! নাই থাক আমাদের জাতের মিল—কিন্তু তাই বলে প্রেম কি কখনো অবিশ্বাস্য হ'তে পারে! তোমার আমার জাত নেই, আমরা শুধু মানুষ! আর আমাদের দুজনের ধর্ম্ম বলে যদি কিছু থাকে তা প্রেম!

শ্যামলী নীরব।

—আমি শুধু ভাবি শ্যামলী, তোমার কথা! তুমি বোধ হয়—

বোধ হয় কেন, নিশ্চয়—প্রেম বিতরণ করেছো অপাত্রে! তোমার প্রেমের পাত্র আজ যদি আমি না হ'য়ে অন্য কেউ হতো তাহলে—তাহলে বোধ হয় সুখী হতে পারতে!

—আপনি কি আমার মনে ব্যথা না দিয়ে কোনদিনই কথা বলতে পারেন না! আপনার সঙ্গে আমি যে নিজেকে কিভাবে জড়িয়ে ফেলেছি—আজও কি আপনি তা বুঝবেন না! বলতে বলতে শ্যামলীর গলাটা ভারাক্রান্ত হ'য়ে এলো।

শ্যামলীকে দু'হাত দিয়ে বুকের কাছে টেনে নিয়ে জরিফ বললে, আমার মনের অবস্থা বুঝে তুমি আমায় ক্ষমা কর, শ্যামলী! আমি কবি কিনা তাই মাঝে মাঝে ভুলে যাই বাস্তবতার কথা! আমার মন বলছে শ্যামলী, আমি মরতে পারি না! যদি একান্তই মৃত্যু কোনদিন আসে আচম্বিতে—তবে আসবে তোমার আমার একই সাথে, একই শুভ লগ্নে!

—সে কথা আপনার চেয়ে শ্যামলী জানে আরও ভালভাবে!

—আরও কি কি যেন বলবো ভেবেছিলুম! টেনে টেনে বললে জরিফ।

জরিফের টানা সুরের নকল করে শ্যামলী বললে, আমার কিন্তু আর কিছু শোনবার মত মনের অবস্থা নয়। খিদে আর ঘুম—দুটোই এক সঙ্গে পেয়েছে।

—চল, তবে বেরিয়ে পড়া যাক! ব'লে এক হাতে শ্যামলীর কটিদেশ বেষ্টন করে অন্য হাতে ঘরের খিল খুলে বেরিয়ে এলো জরিফ।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে জরিফ বললে, তোমার বাড়ীতে যদি জানতে পারে?

—জানতে তো একদিন-না-একদিন পারবেই! স্বচ্ছ স্বাভাবিক কণ্ঠে বললে শ্যামলী।

দাঙ্গা বাধার পর চারদিন কেটে গেছে। কিন্তু সহরের বিষাক্ত আবহাওয়া এখনো প্রশমিত হয়নি। ১৪৪ ধারা সারা সহরে বলবৎ, পাঁচ জনের বেশী লোক একত্র জমায়েত হওয়ায় বিপদ আছে। আতঙ্কগ্রস্ত নরনারী পর্দার আড়ালেই আছেন।

একমাত্র রিলিফের লরী ছাড়া রাস্তায় যান-বাহন আজও চালু হয়নি। অফিস, দোকানপাট সবকিছু বন্ধ হ'য়ে অচল অবস্থার সৃষ্টি করেছে। মানুষ এক বেলা, এক সন্ধ্যা খেয়ে দিন কাটাবে তবু আবহাওয়া স্বাভাবিক না হওয়া পর্য্যন্ত কিছুতেই ঘরের বার হবে না। গুজব-সম্রাট নিত্য নতুন গুজব ছড়াচ্ছেন। অফিস করতে গিয়ে ক'জন লোক প্রাণ হারালো—জানা যাচ্ছে সংবাদপত্র মারফৎ। অনিশ্চিত কালের জন্য স্কুল-কলেজ বন্ধ!

বিপন্ন নর-নারীর উদ্ধার ছাড়া আর দ্বিতীয় কাজ কিছুই নেই। একদিকে চলেছে উদ্ধার আর অন্যদিকে চলেছে চোরা-গোপ্তা লুণ্ঠন, হত্যা, গুমখুন!

সহরের এ হেন মারাত্মক অবস্থার মধ্যে পুলিশের একখানা লরী এসে সেদিন দুপুরে দাঁড়াল শ্যামলীদের বাড়ীর গেটের সামনে। ভেবে চিন্তেই শ্যামলী ফোনে তাদের সংবাদ দিয়েছিল এবং মেসের নম্বর না দিয়ে—দিয়েছিল নিজেদের বাড়ীর ঠিকানা। মেসবাড়ীর সামনে রিলিফের লরী এসে দাঁড়ালে গুণ্ডাদের হাতে জরিফের নিষ্কৃতি পাওয়া শক্ত। জরিফ নীচে নেমে বড় রাস্তার ধারে সামনের দরজা দিয়ে লরীতে ওঠবার আগে গুণ্ডারা পিছনের দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে নিশ্চয় তাকে শেষ করে দেবে।

শ্যামলীদের বাড়ীর সামনে রিলিফের লরী দেখে গুণ্ডারা ও পাড়ার লোক অবাক হ'য়ে গেল। ওদের বাড়ীর লোক হ'লো ততোধিক

স্তম্ভিত! ব্যাপার কি! পুলিশের ঠিকানা ভুল হয়নি তো? শ্যামলীর বাবা তাড়াতাড়ি নেমে এলেন ব্যাপারটা বোঝবার জন্য।

লরীর ওপর আর শ্যামলীদের গেটের ওপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রেখে সমনের দল আশপাশে গা ঢাকা দিয়ে রইলো।

ব্যাপারটা এক মুহূর্ত্তে পরিষ্কার হ'য়ে গেল। কম্পিত জরিফের হাত ধরে এনে শ্যামলী তাকে সবার চোখের সামনে লরীতে তুলে দিলে। সবার বিস্ময়, বিহ্বল দৃষ্টি গিয়ে পড়লো শ্যামলীর ওপর! এ কি অবিশ্বাস্য, আশ্চর্য্য ব্যাপার! অশ্রুসজল চোখে শ্যামলী শুধু চেয়ে রইলো জরিফের মুখের দিকে নীরব ভাষায়। উদ্গত অশ্রুকে সে যেন কিছুতেই আর রোধ করতে পাচ্ছে না, সংযমের বাঁধ বুঝি এবার ভেঙে যায়! লরী ছেড়ে দিলে। যাবার আগে জরিফ দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে শ্যামলীকে বোধ হয় শেষ বিদায় জানিয়ে গেল। দু'ফোঁটা জল জমে উঠলো ওর চোখের কোণে, কিসের সে জল—প্রেমের—না কৃতজ্ঞতার!

—কল্পনাতীত একি কাণ্ড করে বসলি শ্যামলী? আমি যে এ কথা ভাবতেও পারিনি, মা!

বাবার মুখের দিকে চাইতে পারলে না শ্যামলী। কোন উত্তরই সে দিলে না। সে ধীর, মন্থর পদে এসে নিজের ঘরের খিল বন্ধ করে লুটিয়ে পড়লো বিছানার ওপর।

এমন একটা শিকার নিজেদের হাতের গণ্ডীর মধ্যে থেকেও হাত-ছাড়া হ'য়ে যেতে দেখে গুণ্ডারা আপশোষে মরিয়া হ'য়ে উঠলো।

শ্যামলীদের বাড়ীর আশ-পাশে দস্তুর মত হল্লা সুরু হ'য়ে গেল। শ্রাব্য, অশ্রাব্য ভাষায় যার যা খুসী সে তাই ব'লে গায়ের ঝাল মেটাতে চেষ্টা করলে। শ্যামলীর বাবা—বুড়ো মানুষ, ভদ্রলোক সাতেও নেই পাঁচেও নেই, একান্ত নির্ব্বিরোধী! উন্মত্ত জনতার সম্মুখীন হ'তে

তিনি সাহস পেলেন না, এক রকম কানে আঙুল দিয়ে দূরে সরে রইলেন।

বাড়ীর কর্ত্তার উদ্দেশে চেঁচিয়ে জনতার মধ্য থেকে একজন বললে, কৈ মশাই! এতো করে ভদ্দোর লোকের ছেলেগুলো চেঁচিয়ে মরছি—বারাণ্ডা থেকে মুণ্ডটা বাড়িয়ে একটা জবাবও দিয়ে যান, জামাই না হয় নাই করলেন।

—এ বাড়ীতে কাছা দিয়ে কাপড়পরা লোক থাকলে কখনো এমন বেলেল্লা কাণ্ড ঘটে! ভাবছে সব—বোবার শত্তুর নেই! আরে বাবা, ও সব ভনিতায় কি আমরা ভুলি? বাড়ীখানি তুলে নিয়ে গিয়ে স্রেফ গঙ্গার জলে ডুবিয়ে দেবো—বামাল সমেত!

—গেট বন্ধ করে কতক্ষণ—ক'দিন কাটাবে বাবা! বাইরে বেরোতেই হবে! আমাদের বুকের ওপর বাস করে আমাদেরই দাড়ি ওপড়ান!

—কিসের অত তোয়াক্কা! পুলিশ ডাকবে ফোন করে? পেট্রোল ঢেলে এক মিনিটে সব কিছু জ্বালিয়ে ছারখার করে দেবো না! শালার বাড়ীকে বাড়ীই লোপাট করে ছেড়ে দেবো, যে কেউ আমাদের বিরুদ্ধে যাবে—সে হিন্দুই হোক আর যেই হোক—

—নিশ্চয় বাড়ীর মধ্যে আরও পাঁচ-সাতজনকে ওরা লুকিয়ে রেখেছে! একে একে সময় বুঝে পাচার করবে! নইলে ওরা দরজা খুলছে না কেন?

—নফরা! যা শালা পেট্রোল নি' আয়! ভাঙ—ভাঙ দরজা—

হৈ হৈ করে উঠলো উন্মত্ত জনতা—ভাঙ ভাঙ দরজা! পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দে সব!

দরজায় ঘা পড়বার ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে শ্যামলী নিজে এসে দরজা

খুলে দিলে। শ্যামলীকে সামনে দেখে জনতা ক্ষণেকের জন্য স্তব্ধ হ'য়ে গেল। তারপর সুরু হ'য়ে গেল অসংযত কণ্ঠের অর্থহীন হল্লা।

শ্যামলী বললে, আমাদের বাড়ীর মধ্যে আর কেউ লুকিয়ে নেই। যদি বিশ্বাস না হয়—আপনাদের মধ্যে দু'পাঁচ জন এসে খুঁজে দেখে যেতে পারেন!

সবার উৎসাহ নিভে যায়। জলন্ত চোখ যেন ওদের ঝিমিয়ে পড়ে। আশাই যখন নেই—অনর্থক হয়রান হ'য়ে তখন আর লাভ কি!

—যত অত্যাচারই আপনারা করুন না কেন, আপনাদের বিরুদ্ধে আমাদের পাড়ার ছেলেদের নামে আমরা অন্ততঃ পুলিশের দরবারে কোন দিন নালিশ জানাবো না!

শ্যামলীর কথা শুনে দৃষ্টি তাদের করুণ হ'য়ে এলো। কারো কারো উঁচু মাথাও বোধ হয় ঈষৎ নত হলো।

—কারণ, আপনারাই আমাদের—আমাদের পাড়া রক্ষা করেছেন!

নিমেষের মধ্যে সমবেত জনতা হাল্‌কা হ'য়ে গেল। কে যে কোন দিক থেকে এসে জমায়েৎ হ'য়েছিল—তাও যেমন বোঝা যায় নি, সরে যে কে কোনদিকে পড়লো—তাও ঠিক বোঝা গেল না।

—আচ্ছা, আচ্ছা—সব ঠিক আছে। যা হবার হ'য়ে গেছে, চল সব—চল!

—অমন একটা-আধটা ভুল মানুষের হ'য়েই থাকে!

শ্যামলী দরজা দিয়ে ওপরে উঠে এলো।

রাত্রে শ্যামলীকে নিজের ঘরে ডেকে পাঠালেন শ্যামলীর বাবা।

শ্যামলীকে বসতে ব'লে ভদ্রলোক কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন, তারপর ধীর সংযত কণ্ঠে বললেন, আমার ছেলে নেই,

একাধারে তুমি আমার ছেলে এবং মেয়ে দু-ই! ছেলেবেলায় তোমার মা তোমাকে ছেড়ে গেছেন, হাজার বাধা-বিপত্তির হাত এড়িয়ে আমি নিজের আদর্শে তোমায় গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু আজ দেখলাম—আমার সে চেষ্টা পূর্ণমাত্রায় ব্যর্থ হ'য়েছে। ভুল আমার ভেঙেছে। তবুও আমি তোমায় তোমার ভ্রম সংশোধন করার সময় এবং সুযোগ দিতে চাই!

নির্ভীক অন্তরে শ্যামলী নম্রকণ্ঠে বললে, ভুল আমি করিনি বাবা!

ভদ্রলোক স্তব্ধ হ'য়ে চেয়ে দেখলেন কন্যার মুখের দিকে। তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, এতবড় কথা তুমি আমার মুখের সামনে নির্লজ্জের মত বলতে সাহস করলে!

—আপনি অনর্থক আমার ওপর রাগ কচ্ছেন। অন্যায় তো আমি কিছুই করিনি, বাবা!

—অন্যায় তুমি কিছুই করোনি? নিজের জাতি, ধর্মে জলাঞ্জলি দিয়ে একটা—

—ধর্ম্মের চেয়ে কি 'মানুষ' বড় নয়, বাবা! ধর্ম্ম মানুষ সৃষ্টি করেনি মানুষই তো ধর্ম্মের স্রষ্টা! আর জাত! মানুষের প্রাণের চেয়ে কি জাতের মূল্য বেশী হতে পারে, বাবা!

বিস্ময়, বিহ্বল নয়নে ভদ্রলোক চেয়ে রইলেন শ্যামলীর মুখের দিকে। এ সব কি বলছে শ্যামলী! এত বড় বড় তত্ত্বকথা, তর্ক-সাপেক্ষ দার্শনিক ব্যাপার ও শিখ্‌লে কবে, কে ঢোকালো এ সব ওর মাথায়! কাঁদতে কাঁদতে কোথা ক্ষমা প্রার্থনা করে প্রায়শ্চিত্তের সুযোগ চাইবে—তা নয়, মাথা উঁচু ক'রে জাত, ধর্ম্মের ব্যাখা সুরু করেছে আমারই সঙ্গে! এরই নাম বোধ হয় যুগধর্ম্ম!

—তা ব'লে তুমি কি মনে কর, ঐ মুসলমানের ছেলেটিকে তুমি বিয়ে করে হিন্দু সমাজে স্থান পাবে?

—সে কথা কোনদিন ভেবে দেখিনি আর ভাববার বিশেষ প্রয়োজন আছে ব'লেও আমার মনে হয়নি। এইটাই আমি বুঝেছি বাবা, ধর্ম্মের চেয়ে, জাতের চেয়ে মানুষের দাম এবং স্থান অনেক ওপরে।

আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিল শ্যামলী, বাধা দিয়ে বৃদ্ধ বললেন, বুঝেছি! কিন্তু তুমি জানো—আমি গোঁড়া হিন্দু! মানুষের চেয়ে ধর্ম্ম এবং জাতের মূল্য আমার কাছে অনেক বেশী। হ'তে পারে এটা আমার কুসংস্কার!

শ্যামলী নীরব।

—অতএব বুঝতে পাচ্ছি—আমাদের মত আর পথ এক নয়! তুমি বড় হ'য়েছো, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য তোমারও আছে,—তাতে আমি হস্তক্ষেপ করতে চাই না।

—আপনি আমায় কি করতে বলেন? জিজ্ঞাসা করলে শ্যামলী।

ইতস্ততঃ করে বৃদ্ধ বললেন, জোর করে আমি অবশ্য তোমায় কিছুই বলতে চাই না, তবে তুমি যদি তোমার মত আর পথ ত্যাগ না কর—তাহলে—

—কি তাহলে, বাবা?

—তাহলে আমার স্থাবর, অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি একজন বিজাতী, বিধর্ম্মীর কবলে যাওয়ার চেয়ে "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিশনে" দিয়ে যাওয়াই আমি শ্রেয় মনে করি। অবশ্য ভাতা হিসাবে তুমি প্রতি মাসে—

শ্যামলী বললে, কোন দরকার নেই বাবা! আপনার স্নেহের চেয়ে কি আপনার সম্পত্তির দাম আমার কাছে বেশী হবে, বাবা! তা ছাড়া আপনারই দেওয়া শিক্ষা ও আদর্শে পেয়েছি আমি সুস্থ ও নির্ভীক মন! পাথেয় হিসাবে এই আমার যথেষ্ট।

গলায় আঁচল দিয়ে ছল ছল জল ভরা চোখে বাবাকে প্রণাম করে নীরবে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো শ্যামলী।

ভোর রাত্রে নিরাভরণা শ্যামলী একান্ত নিঃসম্বল অবস্থায় এক বস্ত্রে বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো। পথের বিপদের কথা সে একবার ভেবেও দেখলে না। খালি পায়ে শ্যামলী হাঁটতে সুরু করলে। মহিমের বাড়ী সে কখন যায় নি। ঠিকানাটাও ঠিক তার মনে নেই। তা নাই থাক, বাড়ীর অবস্থিতিটা সে জরিফের কাছে তো শুনেছিল—খুঁজে বার করতে বিশেষ কষ্ট হবে না। ওখানে ক'দিন থেকে জরিফের খোঁজ করলেই চলবে। যে-কোন রিলিফে আছে এবং সুস্থই আছে। মহিমের সাহায্যে জরিফকে খুঁজে বার করা মোটেই কষ্টকর হবে না। তারপর না পাওয়া গেলে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেই জরিফের চোখে পড়বে।

বাবাকে ছেড়ে আসতে, বাড়ীর মায়া কাটাতে যতটা কষ্ট হওয়া উচিত ছিল ঠিক ততটা শ্যামলীর হলো না, জেদের বশে কষ্টকে সে কষ্ট বলেই আমল দিলে না।

দু' একটা লোক সন্ত্রস্ত হ'য়ে পথ চলছে,—পথঘাট একরকম ফাঁকা বললেই হয়। দু'একখানা মিলিটারী লরী, রিলিফের দু'একটা লরী সাদা কাপড়ের ওপর লাল ক্রস চিহ্ন বুকে নিয়ে হু হু করে ছুটে চলেছে। এ ছাড়া অন্য যানবাহনের চিহ্ন পর্য্যন্ত কোথাও নেই।

শ্যামলী ফুটপাথ ছেড়ে বড় রাস্তার ওপর দিয়েই আপন মনে ঝোঁকের বশে পথ চেয়ে চলেছে। আতঙ্কের একটা শিহরণ যে মনের মধ্যে না জাগছে এমন নয়, কিন্তু জীবন-পথে হঠাৎ নেমে আসা আকস্মিক বিপর্য্যয় তাকে উদভ্রান্ত করে তুলেছে। ভয় বা আতঙ্কের ওপর বড়

হ'য়ে উঠলো তার জেদ। ভয়কে তখন আর ভয় বলেই মনে হলো না।

লরী আসছে, ফুটপাথের ধারে সরে এলো শ্যামলী। লরীখানার গতি ঠিক তার পাশে এসেই রুদ্ধ হলো। চোখের পলকে জন পাঁচেক লোক লরীর ওপর থেকে লাফিয়ে পড়ে শ্যামলীকে শূন্যে তুলে নিয়ে এক রকম ছুঁড়েই দিলে লরীর মধ্যে! দুর্বৃত্তগণ লাফ দিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে লরী তীব্র বেগে ছুটে বেরিয়ে গেল।

* * *

মৃত্যুর অভিযান—রক্তের বন্যা বয়ে গেল বিরাট নগরীর বুকের ওপর দিয়ে। আত্মীয়স্বজনের খবর নেবার জন্য আত্মীয়স্বজন হ'য়ে উঠলো উদ্‌গ্রীব—অস্থির!

জরিফের জন্য মনটা ব্যাকুল হ'য়ে উঠলো মহিমের। সে গাড়ী নিয়ে গোয়াবাগানে জরিফের মেসে যাবে স্থির করলে। সোফিয়াও চাইলে সঙ্গে যেতে। নিষেধ করলে মহিম। তার একাই বেরোতে কেমন সঙ্কোচ হচ্ছিল, এ অবস্থায় মেয়েছেলেকে সঙ্গে নেওয়া কি সমীচীন?

দুপুরের আগেই গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে পড়লো মহিম। কেনাল ওয়েষ্ট রোড ধরে ফুল-স্পীডে গাড়ী ছুটে চলেছে। হঠাৎ গাড়ীর ওপর ইষ্টক বৃষ্টি সুরু হ'য়ে গেল। সঙ্গীন অবস্থা অনুমান ক'রে সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠলো মহিম কিন্তু দমলো না, গাড়ীর মোড় ঘুরিয়ে একটা গলির মধ্যে ঢুকে পড়লো আত্মরক্ষার জন্য। গলিটা যে ব্লক—এ কথা কি জানতো মহিম! গাড়ীর গতি রুদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জনতা গাড়ী সমেত তাকে বেড়াজালে ঘিরে ফেললে। জনতা মহিমকে গাড়ী থেকে টেনে ব্যর ক'রে তারই গাড়ীর পেট্রোল দিয়ে গাড়ীখানায় চোখের সামনে আগুন ধরিয়ে দিলে। রাস্তার ও-পাশে খাল। অকুস্থল থেকে খালের দূরত্ব খুব বেশী নয়।

মহিম—নিরুপায় মহিম প্রাণভয়ে ছুটে গিয়ে লাফিয়ে পড়লো খালের জলে। ওপর থেকে ইষ্টক বৃষ্টি সুরু হলো তার ওপর। মহিম ডুব সাঁতার দিয়ে ওপারে গিয়ে উঠলো।

মাণিকতলা মেন রোড দিয়ে ছুটতে ছুটতে পূব দিকে এগিয়ে চললো মহিম। একটা দোতলা বাড়ীর সামনে গিয়ে সে আর্ত্তকণ্ঠে আছাড় খেয়ে পড়লো।

লুঙিপরা এক ভদ্রলোক এসে দরজা খুলে তাকে ভিতরে নিয়ে বললেন, আপনি বোধ হয় হিন্দু?

মহিমের তখন কি শারীরিক, কি মানসিক—দুই শক্তিই নিঃশেষে ফুরিয়ে এসেছে। কাঁপতে কাঁপতে মহিম দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলে ভদ্রলোকের দুটি পা!

ভদ্রলোক সাগ্রহে মহিমকে তুলে নিলেন। মহিমের অবস্থা দেখে তাঁর চোখের কোণ দুটো তখন জলে ভরে উঠেছে।

—বাঁচাতে আপনাকে পারবো কিনা বলতে পারি না। তবে চেষ্টা ক'রে দেখি—কতদূর কি ক'রতে পারি! আসুন আমার সঙ্গে,—একি, আপনি কাঁপছেন যে!

মহিম—সংজ্ঞাহীন মহিম লুটিয়ে পড়লো সিঁড়ির মুখে। মাথাটা তার রেলিঙের কোণে লেগে রক্ত ঝুঁঝিয়ে পড়তে লাগলো। ভদ্রলোক সিঁড়ির ধাপে বসে আস্ত-ব্যস্ত মহিমের মাথাটা কোলের ওপর তুলে নিয়ে পরনের লুঙির একাংশ ক্ষতস্থানের ওপর চেপে ধরে চাকরের উদ্দেশে আর্ত্তকণ্ঠে ডাক দিলেন, ইয়াসিন! ইয়াসিন!

—হুজুর!

—শিগ্গীর—জলদি এক লোটা পানি!

প্রভুর ডাকে তাড়াতাড়ি ইয়াসিন জল নিয়ে ছুটে এলো। মহিমের চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে তাকে ঈষৎ সুস্থ ক'রে তুললো প্রভু,

ভৃত্য। তারপর তারা হ্’জনে ধরাধরি করে মহিমকে ওপরে তুলে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলে। ক্ষতস্থানটা মুছিয়ে পরিষ্কার করে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলে। মহিম জ্ঞান ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই আবার অজ্ঞান হ’য়ে গেল।

ভোরের দিকে মহিমের জ্ঞান ফিরে এলো। সে চোখ মেলে বললে, আমি—আমি কোথায়?

—আপনি নিরাপদ স্থানেই আছেন! বললেন ভদ্রলোক।

—আপনারা—আপনারা আমায় মেরে ফেলবেন না তো! মহিমের বিভীষিকার ঘোর এখনো কাটেনি।

—তোমার কোন ভয় নেই, মহিম!

—কে—কে কথা বললে? মহিম ঘাড় ফেরাতে চেষ্টা করলে।

—আমি জরিফ! বলতে বলতে জরিফ ওর সামনে এসে দাঁড়াল।

—তুমি! তুমি এখানে—? উঠে বসতে গেল মহিম।

বাধা দিয়ে জরিফ বললে, ব্যস্ত হ’য়ো না। তুমি খুব অসুস্থ। অতি কষ্টে রক্ত বন্ধ করা হ’য়েছে। একটু নড়-চড়া করলে—

—তুমি এখানে কেমন করে এলে?

—সে সব কথা পরে শুনো। আগে এই গরম দুধটুকু খেয়ে নাও।

—না, আগে তোমায় বলতে হবে! ছোট্ট ছেলের মত জেদ ধরে বসলো মহিম।

জরিফ বললে, গোয়াবাগানের মেস থেকে বেরিয়ে রিলিফে গিয়ে আশ্রয় নিই। তারপর আমার এই বন্ধু সোলেমান সাহেব সেখান থেকে এঁর এই বাড়ীতে আমাকে নিয়ে এসেছেন।

গভীর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে মহিম বললে, আমার বাড়ী গিয়ে যদি উঠতে তাহলে আমার আর এ দুর্ভোগ হতো না। দাও—দুধ দাও।

—আচ্ছা সে সব কথা পরে হবে।

দুধ খেয়ে মহিম বললে, ধন্যবাদ—অশেষ ধন্যবাদ, সোলেমান সাহেব।

—ধন্যবাদ দেবার সময় অনেক পাবে, এখন একটু ঘুমোতে চেষ্টা কর! বলে জরিফ ওর গলা পর্য্যন্ত চাদরখানা টেনে দিলে।

জরিফের হাতখানা নিজের বুকের ওপর চেপে ধরে মহিম বললে, আজও তাহলে তুই বেঁচে আছিস!

—আমি একা নই, আমরা উভয়ে!

বর্দ্ধিষ্ণু, ধনী এবং শিক্ষিত ভদ্রলোক হিসাবে সোলেমানকে ও-অঞ্চলের গুণ্ডাপ্রকৃতির বহু মুসলমানই খাতির করে এবং ভয় করে।

সেদিন সকালে পাশের বস্তির সর্দ্দারদের ডেকে সোলেমান মিয়া বললেন, তোমাদের আমি আগেও বলেছি আর আজও বলছি—মরদে মরদে লড়াই করো কিন্তু জেনানার গায়ে হাত দিও না! কিন্তু তোমরা আমার কথা কানেই তুলছো না। বিপদ যদি আসে তখন কিন্তু আমি তা ঠেকাতে পারবো না! সাফ্ জবাব আমি দিয়ে রাখছি!

—হাঁদুরাও তো আমাদের জেনানার বেইজ্জত করেছে!

—শোনা কথা—গুজব হচ্ছে হারাম! তোমরা কেউ চোখে দেখেছো? মনে করো—তোমাদের শোনা কথাই সত্যি, তা বলে তোমরা কি দেবে তার পাল্টা জবাব? হজরতের কি নির্দ্দেশ তা কি তোমরা জানো না!

—আমরা সব সাঁচ্চা আছি, হুজুর!

সোলেমান সাহেব জোর গলায় বললেন, না—তোমরা কেউ সাঁচ্চা নও। কাল সারারাত তোমাদের বস্তির ঘরে ঘরে আমি জেনানাদের

কান্নার শব্দ শুনতে পেয়েছি! খোদার কিরে, বলতো সব—আমার কথা সাচ্ কি ঝুটা?

—সে সব তো হুজুর—আজ ভোরে চালান করে দিয়েছি! শুধু এক শালী বহুৎ হারামী আছে!

—মু সামালসে বাৎ করো! গর্জ্জে উঠলেন সোলেমান সাহেব।

—ই শালা নওয়া আছে, হুজুর! এ্যাই বে—সোলেমান সাব আমাদের হুজুর আছে। ঠিক ঠিক বাৎ করো!

—বুঝেছি, এই সমস্ত নতুন আমদানি লোকই এই সব কাণ্ড বাধাচ্ছে। আর আমাদের বস্তির লোক এই সব নওয়া আদমিকে প্রশ্রয় দিচ্ছে!

নতুন আমদানি করা লোকটি বললে সোলেমান সাহেবের মুখের ওপর, আপনিও তো হুজুর—এক নওয়া হাঁদু আদমিকে আপনার বাড়ীতে লুকিয়ে রেখেছেন!

মরিয়া হ'য়ে বুক চিতিয়ে ফিরে দাঁড়ালেন সোলেমান সাহেব। বললেন দীপ্ত কণ্ঠে, উ লোক আদমি নেহি—উ হামারা দোস্ত, হামারা কলিজা! পহেলা হামারা জান লে লেও—চাক্কু বসাও, পিছে উস্কা জান লে লেও!

নতুন লোকটিকে ধাক্কা দিয়ে জনৈক সর্দ্দার ধমক দিয়ে উঠলো, এ্যাই বে—কিসকো সাৎ বাত. করত্যা তুমারা মালুম হ্যায়! হুজুরের চোখে পানি এসে গেছে। চুপ বে—শালা, কাঁহাকা!

নিজের দুর্ব্বলতা ঢাকা দিতে সোলেমান সাহেব তাড়াতাড়ি চোখের জল জামার হাতায় মুছে ফেললেন।

—চল—আমি সেই মেয়েটির সঙ্গে কথা বলবো! অনিচ্ছাসত্ত্বেও কেউ প্রতিবাদ করতে সাহস করলে না।

সদলে সোলেমান সাহেব বস্তির মধ্যে গিয়ে ঢুকলেন।

বস্তি—স্বনাম ধন্য বস্তি! ভ্যাপ্‌সা গন্ধে পেটের নাড়ীভুঁড়ি বেরিয়ে আসে। কাদা প্যাচপেচে সরু পথ বেয়ে ওরা বস্তির মাঝখানে এসে দাঁড়াল। ছোট্ট একফালি একটা ঘর—দু'টো তালা দিয়ে বন্ধ। নতুন আমদানি করা গুণ্ডাটি তালা খুলে দিলে।

দিনের বেলাতেও ঘরের মধ্যে নেমে এসেছে বিশ্বের অন্ধকার। আলো-বাতাসের জন্য একটা ছোট্ট ঘুলঘুলিরও ব্যবস্থা নেই। নেঙটি ইন্দুরগুলো ঘরময় ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। গোটা কয়েক চামচিকে কিচমিচ করতে করতে খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। নবাগত আগন্তুকদের গা, মাথা, মুখের ওপর উড়ে এসে বসলো এক ঝাঁক আরসোলা।

চোখের দৃষ্টিকে খরতর ক'রে না তুললে বো[illegible]ক্ত যে ঘরের মধ্যে কেউ আছে কিনা। সোলেমান সাহেব দেশলাই [illegible]লে ঘরের মধ্যে দু'পা এগিয়ে গেলেন।

স্তব্ধ হ'য়ে পা টেনে নিলেন সোলেমান সাহেব, আ[illegible] একটু হ'লে ভূলুণ্ঠিতা মেয়েটির মাথার ওপরই পা দিয়ে বসতেন কিন্তু একি জঘন্য, অবিশ্বাস্য ব্যাপার! হাত, পা বেঁধে মেয়েটিকে [illegible]তানরা এই জল-ওঠা স্যাঁতসেঁতে মেঝের ওপর ফেলে রে[illegible] দিয়েছে!—না জানি কত অত্যাচারই না মেয়েটার ওপর দি[illegible] বয়ে গেছে! পাশবিকতার চরম নিদর্শন এর চেয়ে আর কি হতে পারে। মেয়েটি আর্তনাদ করে না মোটে—শুধু ওর চোখ দিয়ে দর-বিগলিতধারে জল গড়িয়ে পড়ছে।

সোলেমান সাহেবের নির্দ্দেশে মেয়েটির বাঁধন খুলে দেওয়া হলো। মেয়েটি অতি কষ্টে উঠে বসলো।

—দিনের পর দিন এ-যম যন্ত্রণার চেয়ে আপনারা আমায় মেরে ফেলুন! কাতর, অসহায় কণ্ঠে বললে মেয়েটি।

—ক'দিন এ ভাবে আপনাকে আটক ক'রে রাখা হ'য়েছে? জিজ্ঞাসা করলেন করুণকণ্ঠে সোলেমান সাহেব।

—আমার মাথার ঠিক নেই। তবে দিন তিনেক হবে। নত মস্তকে বললে মেয়েটি।

—এরা আপনাকে কি বলতে চায় বা আপনাকে নিয়ে কি করতে চায়?

আনকোরা আমদানি সয়তানটি কি যেন বলতে যাচ্ছিল, সোলেমান সাহেব ধমক দিয়ে উঠলেন।

—আপনার কোন ভয় নেই, নির্ভয়ে বলুন।

মেয়েটি করুণ চোখে সোলেমান সাহেবের মুখের দিকে চেয়ে বললে, এরা আমায় কলমা পড়িয়ে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে কোন মুসলমানের সঙ্গে বিয়ে দিতে চায়! কিন্তু—

মেয়েটিকে স্তব্ধ হ'তে দেখে সোলেমান সাহেব বললেন, বলতে বলতে থামলেন কেন?

—আমাকে এক পক্ষে বিবাহিতা বলা চলে। আমি হিন্দুর মেয়ে বটে কিন্তু এক মুসলমান ভদ্রলোকের আমি বাক্‌দত্তা স্ত্রী! তিনি বাঙ্‌লা দেশের একজন—

বলতে বলতে মেয়েটি সঙ্কুচিতা হলো।

—হ্যাঁ, তারপর? কথার ভাবে বোধ হচ্ছে—আপনার ভাবী স্বামী একজন খ্যাতনামা লোক!

—তিনি একজন তরুণ সাহিত্যিক। মেয়েটির চোখ দু'টি আবার জলে ভরে উঠলো।

স্মিতহাস্যে সোলেমান সাহেব বললেন, আমাদের জরিফ নয় তো?

—কি—কি নাম বললেন? চেনেন—চেনেন আপনি জরিফকে? তিনি বেঁচে আছেন তো—? সুস্থ আছেন নিশ্চয়—? কবে তাঁর সঙ্গে

আপনার দেখা হ'য়েছে ? তিনি—তিনিই সাহিত্যিক জরিফ মিয়া তো ? এক সঙ্গে এক নিঃশ্বাসে মেয়েটি এক ঘর প্রশ্ন করে বসলো।

আশ্বাস দিয়ে সোলেমান সাহেব বললেন, আপনি আমার কথা বিশ্বাস করতে পারেন এবং শুনে নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন যে, সাহিত্যিক জরিফ মিয়া নির্ব্বিঘ্নে বেঁচে আছেন এবং আজ—এই আধঘণ্টা আগে আমার সঙ্গে সশরীরে তাঁর দেখা হ'য়েছে।

সোলেমান সাহেবের পায়ের ওপর আছাড় খেয়ে পড়লো মেয়েটি। বললে আর্ত্তকণ্ঠে, দোহাই আপনার! তাঁর সঙ্গে একবারটি আমার দেখা করিয়ে দিন!

—কিন্তু আপনি কি আমার সঙ্গে যেতে পারবেন ? আপনার শরীর যে খুব দুর্ব্বল!

—পারবো—আমি পারবো! চলুন—কোথা নিয়ে যাবেন ? টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল মেয়েটি।

—আসুন আমার সঙ্গে!

সয়তানের দল পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াল।

—আপনার নাম ? জিজ্ঞাসা করলেন সোলেমান সাহেব।

—আমার নাম শ্যামলী!

আবহাওয়া নামেমাত্র প্রশমিত। তলে তলে খুন-জখম-হত্যা, অগ্নিকাণ্ড, লুণ্ঠন পূর্ব্বের মতই চলেছে তবে অল্পপাতে কিছু কম। কোন সম্প্রদায় নিজের এলাখা ছেড়ে অন্য এলাখায় যায় না। দোকান-পাট, যান-বাহন যেমন বন্ধ ছিল তেমনি বন্ধই আছে। নিখোঁজ ব্যক্তিদের খোঁজ আজও মেলেনি। বিশেষ কাজে আজও যারা নিজেদের এলাখা ছেড়ে অন্য এলাখায় যাচ্ছে—তারাও অনেকে ফিরছে না। সন্ত্রস্তভাব আজও কাটেনি। গুজব সম্রাট নানা আজগুবি খবরে পাড়াকে পাড়া,

মহল্লাকে মহল্লা সরগরম ক'রে রেখেছে। মাছ, তরিতরকারীর অনটনে সহরবাসী ডাল-ভাতে কোনরকমে দিনগত পাপক্ষয় করছে।

দিনের চেয়ে রাত্রের আতঙ্ক বেশী। আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণের জন্য ভিতরে ভিতরে দু'সম্প্রদায়ই প্রস্তুত হচ্ছে। কবে, কোথায় কোন সময়ে যেন রণভেরী বেজে উঠবে—সেই চিন্তাতেই সকলে উদ্‌গ্রীব।

কানু ছাড়া কোন গীতের প্রচলন এক সময়ে যেমন ছিল না, আজও তেমনি দু'সম্প্রদায়ের আত্মঘাতী যুদ্ধের আলোচনা ছাড়া আর অন্য কোন কথা নেই। আলোচনা করতে করতে আর শুনতে শুনতে কান যেন ঝালাপালা হ'য়ে গেল, মনটা গেল বিগড়ে। শয়নে, স্বপনে কিবা জাগরণে মানুষের মনে ঐ একই চিন্তা।

রাত গভীর হ'য়ে আসে কিন্তু কথা শেষ হ'তে চায় না। ক্ষুধার উদ্রেক নেই, চায়ের পর চায়ের পিয়ালাই শুধু শেষ হচ্ছে। দু'টি সম্প্রদায়ের চারটি অভিন্নহৃদয় বন্ধুর মিলন-বৈঠকে পড়েছে আসন্ন বিচ্ছেদের ছায়া।

—কাঁহাতক আপনি আর আমাদের নিয়ে বিব্রত হবেন, সোলেমান সাহেব! নিজের দিকটা ভেবে না চললে হয়তো আপনাকেও বিপদে পড়তে হবে! বললে শ্যামলী।

—সে কথা সত্যি। নিজের পাড়ার দলকে নয় কোন গতিকে আপনি ঠেকিয়ে রেখেছেন কিন্তু বে-পাড়ার দল এলে তখন আমাদের মৃত্যু তো অনিবার্য্য—সঙ্গে সঙ্গে আপনাকেও তারা কম বিপর্য্যস্ত করে তুলবে না! আমাদের আশ্রয়দাতা হিসাবে আপনাকে তারা রেহাই দেবে ব'লে তো মনে হয় না। বলে মহিম একটা সিগারেট ধরালে।

জরিফ নীরবে যেমন বসেছিল তেমনি বসেই রইলো।

শ্যামলী বললে, যে কোন উপায়ে আজ রাত্রেই আমাদের এখান থেকে চলে যেতে হবে!

—কিন্তু কেমন করে যাবেন? রিলিফের লরীর জন্যে চেষ্টা করেছিলুম কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কিছু করে উঠতে পারিনি। পাড়ার লোকে আমার ওপর কড়া নজর রেখেছে। আপনাদের একা বাড়ীতে রেখে আমি নিজেও কোথা যেতে পাচ্ছি না, কি জানি—যদি আমার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে গুণ্ডারা এসে বাড়ী চড়াও হয়। তারপর আর একটা মুস্কিল, শ্যামলী দেবীকে ছেড়ে জরিফ এখানে থাকতে রাজি নয়! এ অবস্থায়—

সোলেমান সাহেবকে কথা শেষ করতে না দিয়ে মহিম বললে, সে বিষয়ে আপনার কোন চিন্তা নেই সোলেমান সাহেব! কোনরকমে জরিফকে একবার আমার বাড়ীতে নিয়ে তুলতে পারলেই হয়!

—মনে করুন—জরিফকে আপনার বাড়ীতে নিয়ে তুললেন! কিন্তু আমার মত সেখানে আপনাকেও যে বিব্রত হয়ে উঠতে না হবে—এ কথাই বা আপনি কেমন করে জানলেন? ভার গলায় জিজ্ঞাসা করলেন সোলেমান সাহেব।

জরিফের দিকে চেয়ে মহিম হেসে বললে, আপনাদের সম্প্রদায়ের লোক তো ওকে বলে কাফের। ওর না আছে দাড়ি আর না আছে গোঁফ, মাথায় এক রাশ রুক্ষু চুল। তালতলার চটি পায়ে ধুতি পাঞ্জাবী পরে ও যখন রাস্তায় বেরোয় তখন আপনিই ওকে হিন্দু বলে ভুল করবেন। তার ওপর মাথায় যদি একটা [illegible]ক্ষী-ক্যাপ থাকে—ব্যস, তাহলে তো আর কথাই নেই!

মহিমের কথা বলার ধরণে সকলেই হেসে ফেললে।

—সঙ্গে যদি আমার এই বোনটি থাকে—সোনায় সোহাগা! আমার বোন আর ভগ্নীপোত ব'লে ওদের আমি অনায়াসে চালিয়ে নিতে পারবো, সোলেমান সাহেব! হ'তে পারি আমি অন্য সম্প্রদায়-ভুক্ত—জরিফ আপনার চেয়ে আমারও কম বন্ধু নয়!

—সে কথা আমি জানি, মহিমবাবু! তা নইলে মরণের মুখ থেকে ফিরে আপনিই বা আজ আমার আশ্রয়ে এসে পড়বেন কেন? বন্ধু-প্রীতির জন্যে তো আজ আপনার এই অবস্থা!

—প্রেমের জন্যও বলা যায়, অবশ্য আমার নয়—শ্যামলী দেবীর!

মহিমের এই সময়োচিত সরস রসিকতা সকলেই উপভোগ করলে। লাজ-নম্র হাসি ফুটে উঠলো শ্যামলীর মুখে-চোখে। সে-হাসি লুকোতে বৃথাই সে অন্যদিকে মুখ ফেরালে।

ভোরের দিকে সোলেমান সাহেব অতি কষ্টে একখানা ঘোড়ার গাড়ী জোগাড় করলেন। বোরখা ঢাকা দেওয়া একটি মেয়ে এবং লুঙিপরা তিনজন পুরুষ আরোহী নিয়ে গাড়ীখানা মন্থরগতিতে নারকেলডাঙ্গা মেন রোডের মধ্য দিয়ে এসে রাজাবাজারে পড়লো।

খবরদারী করার লোকের অভাব হলো না রাস্তার মোড়ে মোড়ে। সোলেমান সাহেব অনেকেরই পরিচিত এবং মুখ চেনা। অচেনা নবাগতের দল সোলেমান সাহেবের মুখের কথা শুনেই ঠাণ্ডা হলো। সন্দেহের অবসর কেউ-ই পেলে না।

গাড়ীখানা এসে শিয়ালদহ ষ্টেশনের অদূরে দাঁড়াল। নিজের এলাখা পেরিয়ে আর বেশীদূর এগোনা তাঁর পক্ষে মোটেই নির াদ নয়।

গাড়ী থেকে নেমে সোলেমান সাহেব নিজে বোরখা পরিহিতা শ্যামলীর হাত ধরে ধীরে ধীরে ষ্টেশনের ভেতর গিয়ে ঢুকলেন, পিছনে তাঁর জরিফ আর মহিম।

ষ্টেশনের একাংশে গিয়ে শ্যামলী বোরখা খুলে ফেললে। সোলেমান সাহেব ছাড়া জরিফ আর মহিম দু'জনেই লুঙি ছেড়ে ধুতি পাঞ্জাবী পরে পুরোদস্তুর হিন্দু হ'য়ে গেল।

সংক্ষেপে বিদায়পর্ব্ব শেষ করে নিয়ে ওরা ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে এলো, দূরত্বের ব্যবধান রেখে সোলেমান সাহেবকেও বেরিয়ে আসতে

দেখা গেল। ষ্টেশনের সিংহদ্বারে এসে আড়চোখে বন্ধুদের দিকে চেয়ে সাহেব সারকুলার রোড ধরে রাজাবাজারের দিকে এগিয়ে চললেন। শ্যামলীকে মাঝখানে নিয়ে ওরা দু'বন্ধু হ্যারিসন রোড ধরে পশ্চিম মুখে চললো।

শ্রদ্ধানন্দ পার্কের দক্ষিণ দিকে মহিমের বাড়ী। বাড়ী পৌঁছাতে ওদের বেশী সময় লাগলো না।

সোফিয়াকে যেন চেনা যায় না, মাত্র ক'টা দিনে তার বয়স যেন কয়েকবছর এগিয়ে গেছে। সোফিয়া কি ভাবে যে ওদের সাদর অভিনন্দন জানালে তা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। মহিমকে দেখে সত্যিসত্যিই বেচারী সবার সামনে ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেললে। মহিম যে কোনদিন আবার তার কাছে ফিরে আসবে—এ বিশ্বাস সে হারিয়ে ফেলেছিল। চিন্তায় ভাবনায় মানুষের বয়স যে বেড়ে যায়—এ শুধু কথার কথা নয়, প্রিয়হারা সোফিয়াই তার জাজ্বল্য প্রমাণ।

শ্যামলীর সঙ্গে তার চাক্ষুষ পরিচয় আছে, নেই শুধু মৌখিক পরিচয়। তা নাই থাক, প্রত্যক্ষভাবে না হলেও—পরোক্ষভাবে ওরা পরস্পর স্পরস্পরকে বেশ ভালভাবেই জানে।

পৌঁছাতে না পৌঁছাতেই সারা পাড়ায় খবর রটে গেল—বোন আর ভগ্নীপোতকে উদ্ধার করে মহিম সশরীরে ফিরে এসেছে। সারাটা দিন বাড়ী ওর গুলজার। বন্ধু, বান্ধব, লোকজনে সদাই সরগরম। অভিনন্দনের জ্বালায় প্রাণ তার অস্থির হয়ে উঠলো, সারাদিনে সোফিয়ার সঙ্গে সে ভাল করে দু'চারটে কথা বলারও অবসর পেলে না। শুধু অভিনন্দন নয়, সঙ্গে আবার দুঃখ প্রকাশও আছে। অভিনন্দন হচ্ছে মহিমের জন্য আর দুঃখ ও সহানুভূতি প্রকাশ তার মোটারের জন্য।

ভাগ্যে সান্ধ্য-আইন বলবৎ ছিল নইলে সারারাত্রি ধরেই হ'য়তো

চা, জলখাবার, অভিনন্দন, দুঃখপ্রকাশ পর্য্যায় ক্রমে চলতো। রাতের আঁধার নামার সঙ্গে সঙ্গেই আগন্তুকদের সংখ্যা কমে এলো, একান্ত দুঃসাহসী দু'চার জন যা ছিল তারাও তাড়াতাড়ি চা-পান সেরে যে যার সরে পড়লো। সেদিনের মত হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো মহিম।

একটু রাত করেই ওদের পারিবারিক চায়ের আসর বসলো— শ্যামলী, সোফিয়া, মহিম, জরিফ এইবার প্রাণখুলে একত্রে কথা বলার অবসর পেলে।

সবার চেয়ে চোখে পড়ে সোফিয়াকে, সারাদিনে ওর একি অত্যাশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন। চোখ-মুখের চেহারা হঠাৎ ওর এমন বদলে গেল কেমন করে! ফ্যাকাসে মুখের ওপর মাত্র কয়েক ঘণ্টায় ফুটে উঠলো একি অপূর্ব্ব লাবণ্য! সকালে যে সোফিয়াকে দেখা গিয়েছিল —এ যেন সে সোফিয়া নয়, এ যেন আর এক নতুন মানুষ, মহিম-হারা সোফিয়া ছিল নিষ্প্রাণ আর এর চোখে মুখে, সারা অঙ্গে প্রাণের স্পন্দন!

প্রথমেই সোলেমান সাহেবকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়ে ওদের চায়ের মজলিস শুরু হলো। মহিম বললে, একটা মানুষ দেখলুম, সোফিয়া! সে হিন্দু নয়, মুসলমান নয়—তার স্থান আমাদের অনেক ওপরে! সোলেমান সাহেবকে যে না দেখেছে—সে তাকে অন্যের মুখের কথা শুনে বুঝতে পারবে না। খাঁটি মানুষ!

—শ্যামলীর কাছ থেকে আমি সব শুনেছি। বললে সোফিয়া।

—শুনে তাকে বোঝা যায় সোফিয়া!—শুনে তাকে বোঝা যায় না। ও-রকম মানুষ জরিফের মত কবিরাই কল্পনায় কলমের আঁচড় দিয়ে সৃষ্টি করতে পারে,—বাস্তবজগতে ওদের দেখা মেলে কালে-ভদ্রে ক্বচিৎ—কদাচিৎ! কেমন, তাই নয় শ্যামলী?

—সোলেমান সাহেবের সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে আমি যেন কেমন

ভাষা হারিয়া ফেলি মহিমদা! তাঁর কথা যতবার বলতে গিয়েছি ততবারই আমার চোখ দুটো জলে ভরে এসেছে। শ্রদ্ধার অতি বড় পাত্র আমি এই প্রথম দেখলাম। বলতে বলতে শ্যামলীর গলাটা ভারাক্রান্ত হ'য়ে এলো।

কথার মোড় ঘুরিয়ে দিলে মহিম। বললে, কথায় কথায় হয়তো কাজের কথাই ভুলে যাবো। দিন কয়েকের জন্য জরিফের নামটা পালটানো বিশেষ দরকার। সাধারণের সুবিবেচনায় মহিমের ভগ্নীপোত মাধব বা ঐ ধরণের কিছু একটা হ'তে পারে, কিন্তু জরিফ হয় কেমন করে। জরিফ! তোমার নামটা তুমি পালটে ফেলে নতুন নামকরণ একটা করে ফেল!

সকলেই স্মিত হাস্যে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো।

—আঃ এতে এমন ভাববার কি আছে? ব'লে মহিম শ্যামলীর দিকে চেয়ে বললে, আচ্ছা দিদি—জরিফের নামটা তুমিই ঠিক করে দাও তো?

—আমার ঠিক মাথায় আসছে না! বললে শ্যামলী হাসিমুখে।

—না ভেবে চিন্তেই! বেশ—নামকরণের ভারটা আমিই নিচ্ছি। আচ্ছা জরিফ! শ্যামলীর সঙ্গে মিলিয়ে তোমার সাময়িক একটা নাম রাখায় তোমার আপত্তি আছে? নেই—কেমন? বেশ—তোমার নব নামকরণ হলো শিবকালী। শ্যামলী আর শিবকালী—কোথাও ছন্দ পতন নেই! কেমন—রাজি তো? বলে মহিম বন্ধুর পিঠটা একবার চাপড়ে দিলে।

জরিফ বললে, তথাস্তু!

—মনে থাকে যেন, কাল থেকে আমার যে-কোন লোকজনের সামনে তোমায় 'শিবকালী' ব'লে ডাকবো। ঠিক সময়ে উত্তর দিতে যেন ভুল না হয়। আজ সারারাত ধরে 'শিবকালী' নামটা জপ কর!

—আমাকে তাহলে পুরোদস্তুর হিন্দু করেই ছাড়লে?

শ্যামলীর দিকে আড়চোখে চেয়ে মহিম সরস কণ্ঠে বললে, হিন্দুর মেয়ের সঙ্গে প্রেম করতে পারো আর দিন কয়েকের জন্যে একটা হিন্দু-নাম নিতেই বুঝি—

—আমি কিন্তু মহিমদা—এবার উঠে যাবো! কৃত্রিম ঝঙ্কারে লাজ-মিশ্রিত কণ্ঠে বললে শ্যামলী।

মহিম বললে, রসিকতাটা কি বড়ই উচ্চাঙ্গের হ'য়ে গেল?

—খালি বাজে কথা! ঘাড়টি ঈষৎ হেলিয়ে বললে শ্যামলী।

সোফিয়া আর জরিফ উভয়ে নীরবে মুচকে মুচকে হাসে আর ওদের সরস কথা উপভোগ করে।

—আমি বলি—আর এক কাপ করে চা হোক। বললে সোফিয়া।

—যে কোন মধুর আলোচনার চেয়ে তা আমার কাছে মধুরতর। সোৎসাহে বললে জরিফ।

—সঙ্গে আর একটা জিনিষ! বলে সোফিয়া অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো শ্যামলীর দিকে।

—কি আর এমন অপরূপ জিনিষ, ডিমের হালুয়া বইতো নয়! বললে শ্যামলী।

—অপরূপ হ'তো না যদি আপনি নিজে হাতে করে তৈরী না করতেন। বললে সোফিয়া।

—আবার 'আপনি'! কৃত্রিম ক্রোধদীপ্ত নয়নে শ্যামলী চাইলে সোফিয়ার দিকে।

—বড্ড ভুল হ'য়ে গেছে। তুমি—তুমি! বলে হোঃ হোঃ করে পুরুষালি হাসি হাসলে সোফিয়া।

—অষ্টম প্রহর শেষ হ'তে না হ'তেই 'আপনি' থেকে 'তুমি'! নাঃ মেয়ে জাতটার সত্যিই বাহাদুরী আছে। তুমি যাই বল জরিফ,

মেয়েদের মত অল্প সময়ে ভাব জমাতে পুরুষজাতটা কিন্তু আজও পারলে না। ও-বিষয়ে যুগযুগান্তর থেকে সুরু করে আজও পর্য্যন্ত আমরা সমান backwardই রয়ে গেলাম। আদাব—বেগম-সাহেবা!

কৃত্রিম রোধ কষায়িত নেত্রে সোফিয়া মহিমের দিকে বারেকের তরে কটাক্ষপাত করলে মাত্র। সোফিয়ার হাস্য-উদ্দীপক কটাক্ষে শ্যামলী কিছুতেই হাসি সংবরণ করতে পারলে না।

যথাসময়ে চা এলো, হাসি-কথা-গল্পে মুখর হয়ে উঠলো ওদের মিলিত বৈঠক।

হাসি-কথা-গল্পের মধ্য দিয়ে কাটলো প্রায় মাস দুই। মহিম ব্যবসায়ী লোক, ব্যবসা তার একদম বন্ধ, বাড়ীতে বসে রেডিয়ো শোনা ছাড়া এক ঘেয়ে বৈচিত্র্যহীন জীবনকে সজীব করে তোলবার আর কোন উপায়ই নেই। বাড়ীর মধ্যে বদ্ধ থেকে থেকে প্রাণ যেন সবার অস্থির, অধৈর্য্য হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু নিরুপায়। এখনো মানুষ নিশ্চিন্ত হ'য়ে পথ চলতে সাহস পায় না। চোরের মত চঙ-মঙ করতে করতে সন্ত্রস্ত হ'য়ে যদিও বা বিশেষ কাজে দুপুর বেলা পথে বের হয়—সন্ধ্যার ছায়া নামবার অনেক আগেই ফিরে আসে মানুষ যে যার বাড়ীতে।

হাঙ্গামা সংক্রান্ত নিত্য নতুন সংবাদ।

মহিম আর সোফিয়া একান্ত সাংসারিক লোক। সংসার, নিজেদের সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য নিয়েই তারা মাতোয়ারা। সমাজের ধার তারা ধারে না, সমাজপতির রক্তচক্ষুকে ভয় তাদের নেই। 'যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ'—জীবনধারণে এই তাদের প্রকৃষ্ট পন্থা! বড় বড় তত্ত্বকথা নিয়ে মাথা তারা ঘামায় না। হিন্দু, মুসলমানের মিলন সাধিত হোক

বা নাই হোক তাতে তাদের বিশেষ কিছু যায় আসে না। তবে মারামারি, কাটাকাটি না হওয়াই বাঞ্ছনীয়, কারণ তাতে তাদের ব্যবসা হ'চ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত !

মহিম সোফিয়াকে জীবনসঙ্গিনী করেছে নিজের সুখের জন্য, দেশ দশ ও সমাজের হিতের জন্য নয়। তা ছাড়া সমাজের হিত ও অহিতের প্রশ্ন নিয়ে কোনদিন সে মাথাই ঘামাতে প্রস্তুত নয়। মেসের ম্যানেজার মিল তার বন্ধ করে দিয়েছিল, না জেনে ভরদুপুরে খেতে গিয়ে শুকনো মুখে যেদিন সে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছিল—কোথায় ছিল সেদিন সমাজ ! সমাজের হিতের জন্য নাই হোক, মহিম কিন্তু ভালবাসে সোফিয়াকে !

জরিফ কিন্তু এ পথের পথিক নয়। শ্যামলীকে সে ভালবাসে, ভালবাসা তাদের অকৃত্রিম। এই অকৃত্রিম ভালবাসা দিয়ে তারা চায় দু'টি বিভিন্ন সমাজকে জয় করতে, সমাজপণ্ডিতদের চিত্তে প্রেমের আধিপত্য বিস্তার করতে !

জরিফ আর শ্যামলীর কথা শুনে ওরা হাসে। মহিম আর সোফিয়া ওদের কথার তাৎপর্য্য বুঝতে না পেরে ওদের প্রকাশ্যভাবেই ঠাট্টা করে। বলে, কাব্যলোকে থেকে জরিফের কাছে কল্পনাই বড় হ'য়ে উঠেছে, বাস্তবতার ধারও ধারে না। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে কল্পনার চেয়ে কাজের দামই বেশী ! কাজ মানেই হচ্ছে অর্থ সংগ্রহের নিত্য নূতন অভিনব ফন্দী ! বাস্তব-রাজ্যে যারা ঘোরাফেরা করে তারাই পায় অর্থের সন্ধান, আর কল্পনা-রাজ্যের জীবের ভাগ্যে জোটে শূন্য ! জরিফের ভবিষ্যৎ গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন ভেবে ওরা মর্ম্মাহত হয় !

কিন্তু শ্যামলীর কি হলো ! সেও কি কবির ছোঁয়াচ পেয়ে উন্মাদিনী হ'য়ে গেল ? সোফিয়া মনে মনে হাসে। সমাজ—মিলন এই সব অর্থহীন অন্তঃসার-শূন্য কথা নিয়ে দিবারাত্র মাথা ঘামাবার আর অন্ত

নেই শ্যামলীর! যেমন দেব—শ্যামলী দেবী! কোন্ সমাজের লোক যে ওদের মানে তার ঠিক নেই।

সমাজ ওদের মিলনকে মেনে নিল না ব'লে জীবন যেন ওদের ব্যর্থ হ'য়ে গেল। শুধু তাই নয়, ওরা চায় ওদের মিলনের ভিত্তির ওপর গড়ে উঠুক হিন্দু ও মোসলেম সমাজের মিলন-বনিয়াদ!

মহিম আর সোফিয়া ওদের দর্শনতত্ত্ব বুঝে উঠতে পারে না, পারে না বলেই অন্তরালে করে উপহাস!

মানুষের অন্তরাত্মার কাছে অবিদিত কিছু নেই। মহিম আর সোফিয়ার উপহাস ওদের অন্তরাত্মাকে স্পর্শ করে। দুনিয়ার ওপর নিদারুণ ক্ষোভে মন ওদের বিষিয়ে ওঠে। মহিম আর সোফিয়ার মত সারা দুনিয়ার কাছেই ওরা বুঝি উপহাসের পাত্র-পাত্রী ছাড়া আর কিছুই নয়।

জরিফ আর শ্যামলী নিজেদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে মনে মনে সজাগ হ'য়ে উঠলো, কিন্তু খোলাখুলিভাবে নিজেদের সম্বন্ধে কোনো আলোচনাই তারা করলে না। শুধু হতাশার কালো ছায়া ফুটে উঠলো ওদের মুখের ওপর। মহিম আর সোফিয়ার মত ওরা নয়। উদ্দেশ্য সাধনই ছিল ওদের মিলনের চরম সার্থকতা।

এক রকম মরিয়া হ'য়ে ওরা নিঃসম্বল অবস্থায় বেরিয়ে পড়লো। ওরা তো চায় সমাজকে—সমাজ ওদের চায় কি না, ওরা তো চায় মানুষকে আপনার করে নিতে কিন্তু মানুষ ওদের আপনার করে নিতে চায় কি না—সেই হবে ওদের শেষ পরীক্ষা!

মুসলমানপল্লীতে এক খোলার বস্তির মধ্যে গিয়ে উঠলো জরিফ শ্যামলীকে নিয়ে।

জরিফ বাঁধা দিলে হাতের আংটি, শ্যামলী বাঁধা দিলে হাতের চুড়ি, —একমাসের বাসাভাড়া অগ্রিম দিয়ে ওরা স্থিতু হ'য়ে বসলো। জরিফ

বাজার করে—শ্যামলী রাঁধে। বৈকালের দিকে জোড়ে বেড়াতে বেরোয়, গোঁড়া মৌলভী ও সমাজের মেয়েপুরুষরা ওদের দিকে চেয়ে থাকে।

নবাগত জীবদু'টিকে নিয়ে আলোচনা সুরু হ'তে বিলম্ব হলো না। আলোচনা আগন্তুকদের জাত, ধর্ম্ম নিয়ে নয়—তাদের বেপরোয়া চালচলন নিয়ে। মুসলমান হ'য়ে শরিফ দাড়ি রাখে না, ক্ষুর বুলিয়ে মোলায়েম করে গোঁফ দাড়ি কামায়। নমাজ পড়ে না যথা সময়ে, মসজিদের ধার দিয়েও সে কোনদিন পথ চলে না। শ্যামলীকে দেখে তো ওর স্ত্রী বলেই মনে হয়। বোরখা পরা দূরে থাক, রাস্তা চলতে মাথায় তার কাপড়ও থাকে না।

লেখাপড়া জানা 'ভদ্দোর আদমি' হিসাবে ওদের সবাই একটু সমীহ করেই চলে। বিদ্রূপবাণের সম্মুখীন ওদের প্রত্যক্ষভাবে হতে হয় না। ওরা কিন্তু বেপরোয়াভাবে বস্তিবাসীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠতে আপ্রাণ চেষ্টা করে। যেচে কথা কয়—হেসে কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করে—হ'তে চায় বাসিন্দাদের সুখ-দুঃখের অংশীদার!

বস্তির বাসিন্দারা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। দিল খুলে মিশতে ঠিক যেন ভরসা পায় না, কোথায় যেন ওদের বাধে।

দিন যায়।

অস্বস্তির মাত্রা ওদের দিনের দিন লাঘব হ'য়ে আসে। 'ভদ্দোর আদমি' হিসাবে আগন্তুকদের আর ওরা দূরে সরিয়ে রাখতে পারে না। স্বার্থের খাতিরে এগিয়ে ওদের আসতেই হয়।

কেউ আসে চিঠি পড়াতে, কেউ আসে সু-পরামর্শ নিতে, আবার কেউ'বা আসে চাকরীর সুযোগ-সন্ধান নিতে!

ওরা তো এই চায়। দূরে সরে থাকতে তো ওরা চায় না। ওরা চায় নিজেদের লাগাতে অন্যের কাজে।

সেদিন সকালে খবর এলো—পাশের বস্তির [illegible]মিয়ার স্ত্রী তিন দিন ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছে। এ তল্লাটে এমন একটা ডাক্তার নেই যে ডেকে দেখান যেতে পারে। হিন্দু দু'একজন ডাক্তার যা ছিল—আজ আর তারা নেই। তাদের না-থাকার ব্যাপারে বসিরমিয়ার হাত ছিল অনেকখানি।

প্রসবাগারে নিয়ে গেলে এখনো হয়তো কোনরকমে মেয়েটাকে বাঁচানো যেতে পারে, কিন্তু হিন্দু এলাকার মধ্য দিয়ে কে বেচারীকে প্রসবাগারে নিয়ে যায়।

শ্যামলীকে সঙ্গে নিয়ে জরিফ পাশের বস্তিতে গিয়ে হাজির হলো। শ্যামলী গিয়ে মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলে যে সে প্রসবাগারে যেতে প্রস্তুত কি না? প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে যন্ত্রণার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার আশায় মেয়েটি হাতে যেন স্বর্গ পেলে, রাজি হ'তে তার এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব হলো না।

বিপদ এমনি বালাই, বসিরমিয়াও আজ চোখের জলে জরিফের দুটো হাত চেপে ধরে তার স্ত্রীকে বাঁচাবার জন্যে কাতরকণ্ঠে অনুরোধ করলে।

নিজেদের এলাকায় অসহায় মানুষগুলোর ওপর অমানুষিক অত্যাচার করতে একদিন অনেকেই এগিয়ে এসেছিলো, কিন্তু আজ এই বিপদের দিনে—একটি অসহায় মেয়ের জীবন-মরণ সন্ধিক্ষণে একটি বীরপুঙ্গবকেও এগিয়ে আসতে দেখা গেল না।

একখানা রিকশায় শ্যামলী বসিরমিয়ার স্ত্রীকে নিয়ে আঁতুড় করে বসলো। জরিফ হিন্দুর বেশে চললো রিকশার পাশে পাশে।

সবাই অবাক হ'য়ে চেয়ে রইলো। বসিরমিয়ার চোখ বেয়ে নেমে এলো শ্রাবণের বারিধারা। প্রবীণ মৌলভী সাহেব শুধু মাথা নেড়ে বললেন, হ্যাঁ—মরদকা বাচ্ছা!

যথারীতি বসিরমিয়ার স্ত্রীকে প্রসবাগারে ভর্ত্তি করে তারা যখন বস্তিতে ফিরে এলো তখন দুপুর পেরিয়ে গেছে।

আর যাই হোক বসিরমিয়ার সত্যিই দিল আছে। দরদ দিয়ে অন্ততঃ সে তার স্ত্রীকে ভালবাসে। সকাল থেকে সে নাওয়া-খাওয়া ভুলে তার দাওয়াটির ওপর ঠায় খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসে আছে। স্ত্রীর সংবাদ না পেলে সে জলগ্রহণ করবে না।

জরিফ আর শ্যামলীকে ফিরে আসতে দেখে সে প্রায় পাগলের মত ওদের কাছে ছুটে এলো।

—কোন চিন্তা নেই, মিয়াসাহেব! স্ত্রী তোমার ভালই আছে। ডাক্তারবাবুর সঙ্গে আমি নিজে দেখা করে এসেছি। বললে জরিফ।

—ডাক্তারবাবু 'হাঁদু' না 'মোছলমান'? সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলে বসির।

মনে মনে জরিফ দস্তুর মত বিরক্ত হলো। তবু স্মিত হাসি মুখের কোণে টেনে এনে জরিফ বললে, নিজের মন নিয়ে দুনিয়ার সবাইকে বিচার করতে চেষ্টা করো না, মিয়াসাহেব! ডাক্তারের কোন জাত নেই, ধর্ম্ম নেই! সব জাতের, সব ধর্ম্মের রোগীদের তাঁরা সমান চোখেই দেখে থাকেন। আর এরই নাম হচ্ছে—মানব-ধর্ম্ম!

কি বুঝলে না বুঝলে ঠিক বোঝা গেল না, তবে মিয়াসাহেব জরিফের কথা শুনে সে সত্যিই খুসী হ'য়েছে তা তার মুখ দেখে বেশ স্পষ্ট বোঝা গেল।

সকালের চেয়ে এখনকার পারিপার্শ্বিক আবহাওয়াটার মধ্যে কিছুটা যেন রকমফের আছে। আশে-পাশে অনেককেই এসে জমা হ'তে দেখা গেল। ওরা যে আবার সুস্থ শরীরে বস্তিতে ফিরে আসবে—এ সম্বন্ধে হয়তো অনেকেরই সন্দেহ ছিল। তা নইলে এ অহেতুক কৌতূহল কেন?

আশ্চর্য্য! তাদের মধ্যে প্রায় একজনও বসিরমিয়ার স্ত্রীর কথা বড় একটা জানতে চাইলে না। সবাই সাগ্রহে জানতে চাইলে হিন্দু এলাকার নরম-গরম আবহাওয়ার কথা! রাস্তার লোক তাদের দেখে কি বললে? নিজেদের এলাখা ছেড়ে অন্যের এলাখায় গেলে অবস্থাটা তাদের কিরকম দাঁড়াবে? এমনি হাজার রকমের অদ্ভুত আজগুবি প্রশ্নের জ্বালায় প্রাণ ওদের অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠলো।

সারাদিনের পর ওরা যখন বাসায় এসে উঠলো তখন সন্ধ্যার আলো-আঁধারে পায়রার খোপের মত ছোট ছোট ঘরগুলি নিবিড় আঁধারে ভরে গেছে।

দেশলাই ফুরিয়েছে। পাশের ঘর থেকে কেরোসিন ল্যাম্পটা জ্বেলে নিয়ে এলো শ্যামলী। দড়ির খাটিয়াটার ওপর পা ছড়িয়ে লম্বা হ'য়ে শুয়ে ছিল জরিফ। উঠে বসে ল্যাম্পের শিখায় একটা সিগারেট ধরিয়ে নিলে।

একগাল ধেঁায়া ছেড়ে জরিফ বললে, এবার বোধ করি সিগারেট ছেড়ে বিড়ি ধরতে হয়। খরচে কুলোনো চাই তো?

শ্যামলী ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে জরিফের পাশে এসে বসলো। বললে, ব্যাটাছেলের যে কোন একটা নেশা না থাকলে কাজে সব সময় মন বসে না। তবে বিড়ি খাওয়াটা আমি সমর্থন করি না। কিন্তু একটা কিছুতো চাই, কি নিয়ে থাকবে?

—নেশা একটা চাই—এই তো? তা আমার তো নেশার অভাব নেই। কাজে মন বসাতে তা-ই যথেষ্ট!

—তার মানে?

সিগারেটটা ডান হাতে নিয়ে বাঁ হাতে শ্যামলীকে জড়িয়ে ধরে জরিফ বললে, সিগারেটের তুলনায় সে নেশার মাদকতা এত বেশী যে

দিশেহারা মানুষ সময় সময় আত্মরক্ষা করতে গিয়ে—আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করে বসে।

বিহ্বলা শ্যামলী জিজ্ঞাসু নেত্রে চেয়ে রইলো জরিফের মুখের দিকে।

—পুরুষের মনস্তত্ত্ব নিয়ে এতো তোমরা মাথা ঘামাও অথচ—

জরিফের মুখখানা দু'হাত দিয়ে সোহাগ ভরে নেড়ে দিয়ে শ্যামলী স্মিত হাস্যে বললে, আমি কি আর বুঝিনি, আমার কথা বলা হচ্ছে ঘুরিয়ে।

—উঃ কি পরিষ্কার মাথা তোমার!

—নেই বা হলাম কবি, তা বলে কি আমার বুদ্ধি নেই?

সিগারেটে একটা সুখটান দিয়ে জরিফ বললে, বাপ্, বুদ্ধি আবার তোমার নেই! আজ কি ভাবে মরণের মুখ থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে কাজটা হাঁসিল করে নিলে! সিট খালি নেই—, নাই থাক—নতুন সিট পাতিয়ে দিতে ক্ষতি কি? শেষ পর্য্যন্ত নতুন সিট পাতিয়ে ছেড়ে দিলে। ডাক্তার সাহেব মুখে কিছু না বললেও মনে মনে তারিফ করলেন—হ্যাঁ, একটা মেয়ের মত মেয়ের পাল্লায় পড়েছি বটে।

—তুমি বুঝছো না, ঐ ভাবে সিটের ব্যবস্থা না করলে মেয়েটাকে বাঁচান শক্ত হ'তো!

পরম দার্শনিকের মত গাম্ভীর্য্যভরা কণ্ঠে জরিফ বললে, কিন্তু এর চেয়ে তোমার বেশী বুদ্ধি থাকলে অবস্থাটা কি দাঁড়াতো তা কি একবার ভেবে দেখেছো?

—অর্থাৎ?

—অর্থাৎ এতোদিনে তোমায় থাকতে হতো হরিণ বাড়ীতে!

—হরিণ বাড়ীতে! শ্যামলীর ভাবটা হচ্ছে সে আবার কোন জায়গা?

জরিফ বললে, সে কি, অমন বিখ্যাত জায়গার নাম শোননি? দেশের যত মাথাওলা স্বনামধন্য ব্যক্তির পায়ের ধুলো প্রায়ই ওখানে পড়ে থাকে। যেমন ধর—ব্যাঙের ছাতার মত হঠাৎ গজিয়ে ওঠা ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, সেয়ার মার্কেটের নামকরা দালাল, ফিলম কোম্পানীর প্রযোজক ইত্যাদি—ইত্যাদি—। বড় স্বাস্থ্যকর জায়গা, যায় যখন নেংটি ইঁদুরটি, আর বেরিয়ে আসে যখন ইয়া মোটা মোষটি। কি সে রুটিন মাফিক খাওয়া-দাওয়া। মানুষ শ্বশুর-বাড়ীতেও এত খাতির পায় না!

স্বাভাবিক কণ্ঠে শ্যামলী বললে, তুমি কি হরিণ বাড়ীর জেলের কথা বলছো?

—উঃ কি সাফ্ মাথা! এমন মাথা হাজারে একটা মেলে—। ওকি মুখখানা যে সঙ্গে সঙ্গে কালো হ'য়ে গেল?

শ্যামলী মুখখানা গম্ভীর করে বললে, ব্যাটাছেলে মাত্রেই ঝগড়াটে!

শ্যামলীকে জোর ক'রে শুইয়ে ফেলে তার মাথাটা তুলে নিলে নিজের কোলে। গালটা ওর টিপে দিয়ে জরিফ বললে, এই মহান তথ্যটা আবিষ্কার করতে তোমার এতটা সময় লাগলো?

জরিফের আদরে গলে গেল শ্যামলী, তা নইলে মোলায়েম কণ্ঠে বলবে কেন, খুঁটি-নাটি ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া বাধাতে এতোও তুমি পারো!

জরিফ আর একটা সিগারেট বার করলে।

ওর হাতটা চেপে ধরে শ্যামলী বললে, শুধু সিগারেট খেলেই কি পেট ভরবে! আর সিগারেট খাওয়া হবে না!

—সিগারেট ছাড়া খাবো কি? তোমার কলসীতে কলের জল ছাড়া ঘরে খাবার মত আর তো কিছু সম্বল নেই! একান্ত অসহায় কণ্ঠে ছোট্ট ছেলের মত বললে জরিফ।

ছোট্ট ছেলেকে মা যেমন ভাবে ক্ষুধার সময় সান্ত্বনা দেয়—ঠিক তেমনি ভাবে শ্যামলী স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললে, মাত্র পনের মিনিট তুমি চুপ-চাপ ক'রে শুয়ে থাকো। আমি তোমার খাবার ব্যবস্থা কচ্ছি।

—ঝগড়া করে খিদে আরও বেড়ে গেল।

—খিদে বেড়েই ছিল, ঝগড়া করার সময় খেয়াল ছিল না। বলতে বলতে খাট থেকে উঠে গেল শ্যামলী।

অস্থায়ী ইটের উনুনটায় আগুন দিয়ে ছোট্ট এ্যালুমিনিয়মের কড়ায় চায়ের জল চাপিয়ে দিলে সে।

—র-চা আমি খেতে পারবো না! শুয়ে শুয়েই বললে জরিফ।

নীরবে হাসলে শ্যামলী। চায়ের সরঞ্জাম সাজিয়ে সে একটা মাটির গেলাস হাতে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

জরিফ ওর ক্ষণেক অনুপস্থিতির সুযোগে লাফ দিয়ে খাট থেকে উঠে তাড়াতাড়ি একটা সিগারেট ধরিয়ে আবার শান্ত শিষ্ট ছেলের মত শুয়ে পড়লো।

সিগারেটটা আধখানাও তখনও শেষ হয়নি—শ্যামলী ঘরে ঢুকে দরজাটা আবার ভেজিয়ে দিলে। আধ-খাওয়া সিগারেটটা খাটের পায়ায় ঘসে নিবিয়ে ফেললে জরিফ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে। কিন্তু সে হাস্যকর ক্ষুদ্র লুকো-চুরির খেলাটা শ্যামলীর দৃষ্টি এড়িয়ে গেল না।

—সিগারেটটা কি এক্ষুণি না ধরালে হ'তো না। চা খাওয়ার পরই তো আবার একটা ধরাতে হবে! শ্যামলীর গাম্ভীর্য্যের এ একটা নতুন দিক।

সত্যিই থতিয়ে গেল জরিফ।

অনিচ্ছাকৃত টানা সুরে অপরাধীর কণ্ঠ ঠেলে বেরিয়ে এলো, তাইতো নিবিয়ে রাখছি, শ্যামলী!

জরিফের ভয়ার্ত্ত কণ্ঠস্বর শ্যামলীর হাসির উদ্রেক করলে। কিন্তু সে

সামলে নিলে নিজেকে। ভাবটা—ভয় ভাঙিয়ে দেওয়া ঠিক নয়, ভবিষ্যতে তাহলে আরও বেশী দুষ্টু হ'য়ে উঠবে।

চা ছাঁকছে শ্যামলী, দরজার কড়া নড়ে উঠলো।

—কে? শুয়ে শুয়েই জিজ্ঞাসা করলে অরিফ।

—আমি, বাবু! বসির—। উত্তর এলো বাইরে থেকে।

—ভেতরে এসো!

সন্ত্রস্তপদে বসির ভিতরে এলো। গামছা করে কি যেন সে নিয়ে এসেছে।

—কি খবর, বসির?

একগাল হেসে বসির গামছা থেকে গোটা কয়েক ডিম মেঝেয় রাখতে রাখতে বললে, কিছু না বাবুসাহেব—, এই গোটাকয়েক আণ্ডা!

—ছিঃ ছিঃ—কেন তুমি অনর্থক পয়সা খরচ করতে গেলে, বসির-মিয়া! সহানুভূতি মেশান কণ্ঠে বললে শ্যামলী।

—পয়সা কেন খরচ করতে যাবো! এ মোর ঘরের আণ্ডা। বিবি তো চলে গেল, আণ্ডা নিয়ে করি কি বলুন! আগে বেচাকেনা করা চলতো—কিন্তু এখন শালার সে পথও বন্ধ। মুরগীর পাল নিয়েই নাটা-ঝাপটা খাচ্ছি—আবার আণ্ডা! যা মেহেরবানী আপনারা করলেন! খোদা আপনাদের মঙ্গল করুক। কে জানে—বিবিটা বাঁচবে কিনা! বলতে বলতে বসিরমিয়ার গলাটা খাদে নেমে এলো।

—ভেবো না বসির, স্ত্রী তোমার বেঁচে উঠবে!

বসিরের চোখদুটো অশ্রুভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠলো।

নিজেকে সামলে নিয়ে বসির বললে, আপনাদেরও তো আজ সারাদিন খানা-পিনে হয়নি, কিছু চাল-ডাল এনে দেবো? কিছু মনে

করোনি আপনারা, এ এলাকায় রেশনের দোকানটা আজও বন্ধ কিনা তাই—

—খোলা থাকলেও বিশেষ সুবিধা হতো না, বসির! র‍্যাশন কার্ড আমাদের নেই। তবে আজ আমাদের চালের দরকার নেই, যা আছে তাতে আমাদের চলে যাবে। তরকারী কিছু ছিল না বটে—সে অভাব তোমার ডিমই পূর্ণ করে দেবে।

—আচ্ছা, আদাব—সাব! চলে যাচ্ছিল বসিরমিয়া।

শ্যামলী তাকে ডাক দিয়ে বললে, তোমার তো আজ সারাদিন খাওয়া হয় নি, মিয়াসাহেব! এত রাত্রে কেন আর হাত পুড়িয়ে রান্না করবে, তার চেয়ে আমাদের এখানে দুটি ডাল-ভাত—

বসির বললে, ক্ষেপেছো আপনারা। এত রাতে আবার চুলো ধরিয়ে রান্না করতে আমার বয়ে গেছে। চাড্ডি ভুজো-টুজো না খেয়ে রাতটা কোন গতিকে কাটিয়ে দেবো! তা ছাড়া—আমার দিলটা আজ তেমন সুবিধে নয়, কেমন যেন হু হু কচ্ছে। বিবিটাকে ছেড়ে কোনদিন থাকিনি কিনা—তাই বোধ হয়। আপনারা তো ভদ্দোর লোক, ঠিক বুঝবে কিনা খোদাই জানে—মার ধোর করি বটে কিন্তু বিবিটাকে আমি ভালবাসি। খোদার কিরে, তার সঙ্গে এতখানি যে আমার আসনাই হ'য়েছে তা কাছে থাকতে বুঝতে পারিনি! বলতে বলতে বসিরমিয়ার গলাটা আবার ধরে এলো।

—তাহলে তোমার জন্যে চাল নিই, মিয়াসাহেব?

—খাবার আমার ইচ্ছে নেই। মন ভাল থাকলে তবেই না খাওয়া! বিবিটা হয়তো আমার এখন পর্য্যন্ত এক ফোঁটা জলও মুখে দেয়নি।

জরিফ বললে, তোমার বিবিকে আমরা দুধ খাইয়ে তবে এসেছি।

কোন চিন্তা নেই তোমার। তুমি আজ রাত্রে আমাদের এখানে দুটি খেয়ে যাও!

—বেশ, খাবো।

জরিফ শ্যামলীর উদ্দেশে বললে, ভাত-ডাল তো বসিরমিয়াকে খাওয়াবে বললে, কিন্তু ডাল তোমার ভাঁড়ারে আছে তো?

—নিয়ে আসবো চাড্ডি ডাল? ভাল মুশুরির ডাল আমার ঘরে আছে। ব্যস্ত হয়ে উঠলো বসির।

—ডাল ঘরে আছে। তোমায় ব্যস্ত হ'তে হবে না, মিয়াসাহেব! বললে শ্যামলী।

—রান্না হয়ে গেলে আপনারা খেয়ে নিও। কত রাতে ফিরবো তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। ভাঁটিখানায় আজ আমাকে একবার যেতেই হবে!

—র‍্যাশনের দিনে ভাত যেন নষ্ট হয় না, মিয়াসাহেব! বললে শ্যামলী।

—না বহিন! আজ রাতে না খাই—কাল ভোরে খাবোই খাবো। বেশী রাত হলে আপনারা শুয়ে পড়ো! আদাব—!

—একটু চা খেয়ে যাও, মিয়াসাহেব! বললে জরিফ।

—চা! আচ্ছা খাই এক পাত্তোর!

চা খেয়ে বসিরমিয়া খুশী মনে চলে গেল। বোধ হয় ভাঁটিখানার দিকেই গেল।

চা পান শেষ করে জরিফ বললে একান্ত অনুগত শিশুর মত, এবার ঐ আধখানা সিগারেট ধরাবো শ্যামলী?

শ্যামলী হেসে ফেললে, বললে, ধরাও।

খিঁচুড়ী চড়িয়ে শ্যামলী বললে, ডিম ভাতে দেবো—না ভাজবো?

—ভাতেও দিও না অথবা ভেজোও না, মামলেট করে ফ্যালো! শুয়ে শুয়ে মন্তব্য করলে জরিফ।

—কথার খুঁত ধরে ঠাট্টা হচ্ছে! সবাই তো আর কবি নয়! গম্ভীর মুখে শ্যামলী খিঁচুড়ীতে কাঠি দিতে লাগলো।

—আধখানা সিগারেটে কিছুই হলো না। চা খাওয়ার পর—

—আর একটা ধরাতে কে বারণ করেছে!

কোন উত্তর না দিয়ে জরিফ শ্যামলীর দিকে পিছন ফিরে শুলো।

শ্যামলীর কথাগুলো বড়ই উপভোগ্য লাগলো জরিফের। প্রিয়া থেকে গৃহিণীর পর্য্যায়ে উঠতে ক'দিনই বা শ্যামলীর লাগলো। এমন মিষ্ট মধুর ঝঙ্কার দেওয়া গৃহিণীরই শোভা পায়, কিন্তু প্রিয়া পায় লজ্জা! প্রেম ঘনীভূত না হ'য়ে উঠলে প্রিয়া ঠিক গৃহিণী হতে পারে না।

গল্প করতে করতে শ্যামলী বললে এক সময়, মাত্র কটা দিনের আমরা এদের আপনার করে তুলতে পেরেছি—তাই নয়? সন্ত্রস্ত ভাবটা এদের কেমন ধীরে ধীরে কেটে আসছে দেখেছো?

জরিফ বললে, হুঁ—!

—হু, মানে—? আমার কথা কি মিথ্যে?

—মিথ্যে নয় স্বীকার করি, কিন্তু যতখানি উৎসাহিত এ ক্ষেত্রে হওয়া উচিত—তোমাকে তার চেয়ে কিছুটা বেশী বলে মনে হচ্ছে।

ক্ষুণ্ণ হলো শ্যামলী। এই বেশ মিল-মিশ খেয়ে গেছে এদের সঙ্গে তবু কেন উৎসাহিত হ'তে পাচ্ছে না জরিফ! এই ঘনিষ্ঠতা কি মৌখিক, অন্তরের যোগাযোগ এর মধ্যে নেই?

আলোচনা এগোবার সূত্র আর খুঁজে পেলে না, আরম্ভেই উৎসের মুখ বন্ধ হ'য়ে গেল। আলোর সন্ধান পেয়ে একজন হ'য়ে উঠেছিল উৎসাহিত কিন্তু অন্যজনের কথায় মন তার দমে গেল, হয়তো ও সত্যিকার আলো নয়—, আলেয়া!

বসিরের আসার আশায় গল্পে গল্পে রাত অনেক হ'য়ে গেল, বসিরের কিন্তু ফেরার নামটি নেই। একজন অভুক্তকে খাবার নিমন্ত্রণ করে তাকে উপবাসী রেখে মানুষে খায় কেমন করে!

রাত গভীর হ'তে গভীরতর হ'য়ে এলো। বসিরের খাবার তুলে রেখে ওরা দু'জনে খেতে বসলো।

খেতে সবে বসেছে এমন সময় বস্তির প্রথমাংশের একদিকে বিপুল হল্লা উঠলো। চমকে উঠলো এরা, তবে কি এই নিশুতি রাতে আবার সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা সুরু হলো নাকি! হাত আর তাদের মুখে উঠলো না, কাঠের পুতুলের মত পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে আড়ষ্ট হ'য়ে কান পেতে বসে রইলো।

কিছুক্ষণ পরে মনে হলো—একদল লোক উত্তেজিত কণ্ঠে কথা বলতে বলতে যেন সামনের ঐ সরু রাস্তা দিয়ে তাদেরই ঘরের দিকে এগিয়ে আসছে।

দু'মিনিট আগে যা শুধু মনে হ'য়েছিল—দু'মিনিট পরে তা-ই সত্যে পরিণত হলো। দরজায় ওদের ঘা পড়লো এবং শোনা গেল উত্তেজিত কণ্ঠের বাইরে বেরোবার আহ্বান!

তবে ভরসার মধ্যে এই যে—এ আহ্বান যুদ্ধং দেহির আহ্বান নয়। শ্রুতিমধুর না হলেও এ আহ্বান মোলায়েম!

খিল খুলে বাইরে আসতেই হয় জরিফকে। শ্যামলী বোরখার দোহাই মানা বিবি নয়, জরিফের পিছু পিছু সেও বাইরে এসে দাঁড়ায়।

—বাল, বাচ্ছা নিয়ে ঘর করি হুজুর! একি ঝঞ্ঝাট শালা লোক লাগায়া। আরে তু শালারা লাঙ্গা আছিস—তোদের কিসের ভয় আছে। আপনি তো লেখাপড়া জানা ভোদ্দোর আদমি আছে—আপনি বিচার করো?

একজন থামে তো আর একজন ধরে, যেতো শালা বদমাস বাহারসে আসিয়ে গেছে। শালা লোক কাফিখানামে খানা-পিনা ক'রে আর রকৃপর শো যায়। এ্যায়সা জুলুম এক-আধ রোজ চোলে, বিশদিন কি চোলে হুজুর?

আসল ব্যাপারটা বোঝাতে যে যার বক্তব্য বলেই চলেছে অথচ ঐ আসল ব্যাপারের ধার দিয়েও যাচ্ছে না।

অনেক কিছুই আবোল-তাবোল বকে যাচ্ছে, শুধু যা বলতে চায়—সেই আসল ব্যাপারটাই তাদের বলা হ'য়ে উঠছে না।

ধৈর্য্য ধরে আর থাকতে পারলে না জরিফ। বললে, সব তো বুঝলাম, শুধু বুঝলাম না—কি তোমরা বলতে চাও?

—হামার কোথা শোন সাব! ঐ শালারা একটা কোথা গুছিয়ে বলতে পারে না। সব শালা ভাঁটিখানার ফেরত।

বক্তার কথার মাঝখানে আর একজন কি যেন বলতে যাচ্ছিল, বক্তা তাকে ধমক দিয়ে বললে, থাম বে শালা—চট্টিওয়ালা! দারু পিয়ে বোঁদ হ'য়ে আছে—ঐ শালা এসেছে ভাদ্দোর-আদমির সঙ্গে বাত-চিত করতে! শুনিয়ে হামার কোথা! পান-সাত শালা লাঙ্গা বহুৎ মাল রাত-বিরেতে চোরি কোরে লুকিয়ে রাখে হামাদের এই বস্তিতে। শালাদের বারণ ক'রে ক'রে হাল্লাক হ'য়ে গেলুম সাব—তবু শালারা কোথা হামাদের কানে তুলে না। এখোন পুলিস যদি জানতে পারে, লেকেন হাল্লা বি আসে তো ঠেকাবে কোন শালা!

বক্তার কথ্য-ভাষার দোষ থাকতে পারে, তবে আসল বক্তব্য বলতে খেই তার হারিয়ে যায় না। আর সব চেয়ে বড় কথা হ'চ্ছে যে—তার কথার মধ্যে যুক্তি আছে।

একান্ত অনুরোধে অকুস্থলে গিয়ে জরিফকে হাজির হতেই

হলো। এবং সেই রাত্রে ব্যাপারটার একটা মীমাংসাও সে করে দিয়ে এলো।

শুধু সৌহার্দ্দ্য স্থাপন ক'রে বেড়ালেই দক্ষিণ হস্ত মুখে ওঠার সমস্যার সমাধান হয় না, বাস্তব-জগতে খেয়ে পরে বাঁচতে হলে টাকা চাই। কিন্তু শুধু উপদেশ দিয়ে এক স্কুল মাষ্টার বা গুরুগিরি কার্য্যে যাঁরা বহাল—তাঁদের ছাড়া অন্যের পেট চলা মুস্কিল। মুস্কিল আসান করতে জরিফকে অর্থের সন্ধানে কলম ধরতে হয়।

কোন একখানি মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রেমের উপন্যাস লিখতে সুরু করলে জরিফ। এবারে তার উপন্যাসের নায়ক নির্ব্বাচিত হলো এক দেশসেবী সাহিত্যিক—জাতে মুসলমান আর নায়িকা এক হিন্দু তরুণী!

মাসের পর মাস উপন্যাসের অধ্যায় যত এগোয়—, প্রতিবাসীর সঙ্গে এদের ঘনিষ্ঠতাও ততখানি এগিয়ে চলে।

দিন যায়—মাস যায়, শীত পেরিয়ে বসন্ত আসে!

পাড়ার মৌলবী সাহেব এসে একদিন অযাচিতভাবে ওদের সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত হ'য়ে উঠলেন এবং নবদম্পতির সম্বন্ধে নানা তথ্য জেনে নিয়ে গেলেন। নিজেদের যারা ব্যক্ত করতে চায়, গোপন তারা কোন কিছুই করতে পারে না!

পরের দিন দুপুরে মৌলবী সাহেব তাঁর দল-বল নিয়ে এসে হাজির হলেন। জরিফকে শ্যামলীর উদ্দেশে বললেন, ও মেয়েটিকে আপনাকে ইসলাম ধর্ম্ম অনুসারে সাদী করতে হবে।

এমন অভাবনীয় অভিভাবকত্ব মোটেই সমর্থন করতে পারলে না জরিফ—মনে মনে ভয়ানক অসন্তুষ্ট হলো, কিন্তু নিরুপায়। সে

স্থির, ধীরকণ্ঠে বললে, হিন্দুর মেয়ে উনি, ওঁর অন্তরাত্মা যদি তাতে সন্তুষ্ট না হয়?

—হতেই হবে। না হলে আপনি ছাড়বেন কেন!

—জোর করে সাদী করা চলে কিন্তু মনের মিল তো হয় না।

মৌলবী জোর গলায় বললেন, ও-সব কথা আমরা বুঝি না। জোর করে আমরা সাদী দেবো!

—কিন্তু আমি তা হতে দেবো না!

সমবেত জনতার মধ্যে একটা উত্তেজনামূলক গুঞ্জনধ্বনি উঠলো। মৌলবী তাদের শান্ত করে জরিফের উদ্দেশে দীপ্তকণ্ঠে বললেন, আমাদের সমাজে বাস করতে গেলে আপনার ইচ্ছে-অনিচ্ছে খাটবে না।

কথা বাড়িয়ে লাভ নেই ভেবে জরিফ চুপ করে রইলো।

সহজে ছাড়বার পাত্র মৌলবী সাহেব নন। তিনি নানা যুক্তি-তর্ক দেখিয়ে হেসে বললেন, হিন্দু ধর্ম্ম অনুসারে মেয়েটিকে আপনি সাদী করবেন? কিন্তু হিন্দুরা কি আপনাদের সমাজে নেবে?

—ও সব আমরা বুঝি না। আমাদের মিলনের মধ্য দিয়ে আমরা চাই—হিন্দু আর মুসলমান দুটি সমাজের মিলন ঘটাতে! আমাদের কাছে কি হিন্দু—কি মুসলমান, উভয়েই সমান শ্রদ্ধার পাত্র। ধর্ম্ম বা সাম্প্রদায়িকতার—

আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিল জরিফ কিন্তু তার বক্তব্যের মাঝখানে কাংস্য, কর্কশকণ্ঠে বললেন, মৌলবী সাহেব, তোমরা ম্লেচ্ছ, কাফের! কোন সমাজেই তোমাদের স্থান হবে না।

মৌলবী সাহেব যাবার আগে দিলেন অভিসম্পাত, আর সমবেত জনতার মধ্যে কেউ দেখিয়ে গেল ভয়, কেউ বা দিয়ে গেল প্রচুর গালাগাল।

আশার সৌধ ওদের এক লহমায় মিশিয়ে গেল পথের ধূলোয়; ওরা পরস্পর পরস্পরের মুখের ওপর শুধু চোখ তুলে চাইলে।

পরের দিন বাড়ীর মালিক এসে তাদের ঘর ছেড়ে দিয়ে সত্বর উঠে যাবার কথা জানিয়ে গেল, শুধু জানিয়ে গেল না—শাসিয়ে গেল।

'ভাঙা বীণা আর জোড়া নাহি যায়'! ইচ্ছা থাকলেও ওরা আর আগের মত বাসিন্দাদের সঙ্গে মিশতে পারে না। বস্তির বাসিন্দারাও যেন হঠাৎ পর হ'য়ে গেল, চক্ষুলজ্জার ধার দিয়েও তারা চললো না।

অচেনা অজানার সঙ্গে আলাপ না জমলে দুঃখের কিছু নেই, কিন্তু একান্ত ঘনিষ্ঠ যদি দেখা হ'লে মুখ ফিরিয়ে নেয়—তবে তা হয় চরম মর্ম্মান্তিক। আপনার জন যদি আলাপের সুযোগ না দেয় তবে তার মত নিদারুণ অস্বস্তি আর কিছু নেই।

প্রাণ তাদের হাঁফিয়ে উঠলো। সমাজচ্যুত একঘরে হওয়ার মত মর্ম্মান্তিক যাতনা বুঝি সংসারে আর দ্বিতীয় কিছুই নেই। বাড়ীওলার জবাব না পেলেও বিশেষ ক্ষতি ছিল না, সর্ব্বজন পরিত্যক্ত হ'য়ে সবার মধ্যে মানুষ কি কখন নিশ্চিন্ত মনে বসবাস করতে পারে! এর চেয়ে নিবিড় জনশূন্য অরণ্য শান্তিপ্রদ, স্বস্তিকর!

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসবার জন্য প্রাণ ওদের ব্যাকুল হ'য়ে উঠলো। অতিষ্ঠ মন নিয়ে ওরা ফিরতে লাগলো ঘরের সন্ধানে। ঘর ছাড়তে হ'লে—ঘর তো একখানা চাই!

মহিমের ওখানে আর ওরা ফিরে যাবে না, যেতে পারে না—যাওয়া ওদের উচিত নয়! দীনতম ভাবে দিন কাটাবার উপযোগী যে কোন একখানা ভাঙা কুঁড়ে হ'লেও চলবে। এ তাদের চরম পরীক্ষা, পরীক্ষা দেবার এবং পরীক্ষা নেবার।

জাতে মুসলমান হলে কি হবে, জরিফ তার কার্য্য-কলাপে হিন্দু ভাবাপন্ন হ'য়ে গেছে। মৌলভী সাহেবের মতে তাই সে কাফের। মুসলমান হ'য়ে সে কিনা হিন্দুর দেব-দেবীর নাম আর তাদের ধর্ম্মগ্রন্থ পুরাণ প্রভৃতির ভাব-ছায়া অবলম্বনে কবিতা-প্রবন্ধ লেখে! সাদী না করা মেয়েছেলে নিয়ে ব্যাভিচারকে প্রশ্রয় দেয়! ও শুধু সমাজদ্রোহী নয়, ইসলামদ্রোহী!

মৌলভী প্রভৃতির প্ররোচনায় তিনদিনের দিন ভোরে বাড়ীওলা তার সাঙ্গ-পাঙ্গ সমেত এসে জরিফের ঘরের সামান্য কটা তৈজসপত্র, বিছানা প্রভৃতি জোর ক'রে ঘর থেকে বাইরে বার ক'রে দিলে!

পাশেই ছিল গয়লাদের একটা মোষের খাটাল। জরিফ আর শ্যামলী তাদের বাইরে-ফেলা-দেওয়া জিনিষপত্র কুড়িয়ে এনে মালিকের মত নিয়ে একপাশে রেখে দিলে।

ঘর না পেলে যায় কোথা—?

ঘরের খোঁজে ফিরতে ফিরতে সারাটা দিন প্রায় অভুক্ত অবস্থাতেই দু'জনের কেটেছে।

আসন্ন সন্ধ্যা। শ্যামলীর বাবা রাধারমণবাবুর খাস খানসামা নন্দীর সঙ্গে বাজারের ধারে ওদের আকস্মিকভাবে দেখা হ'য়ে গেল। নন্দী এসেছে কর্ত্তার জন্যে আফিম কিনতে।

রাধারমণবাবু বাদশাহী তরিবাতে বহুদিন থেকে আফিম খেয়ে আসছেন! দু'সের খাঁটি দুধে তাঁর নিত্য সেব্য আফিম সিদ্ধ হয়, এবং ফুটতে ফুটতে সেই দুধ যখন আধসের আন্দাজ দাঁড়ায় তখন উনুন থেকে দুধের কড়া নামিয়ে ঠাণ্ডা করা হয়। কর্ত্তা খান ঐ আফিম-ফোটান দুধের সরটুকু আর নন্দী খায় বাকি দুধটা।

নেশার মধ্য দিয়ে প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ যে একান্ত নিবিড় ঘনিষ্ঠতম

হ'য়ে উঠবে—এ আর এমন বিচিত্র কি! নন্দীকে তাগিদ দিতে হয় না, নির্দ্দিষ্ট সময়ের কথা একটি দিনের জন্যও মনে করিয়ে দিতে হয় না, ঠিক সময়ে সে কর্ত্তার নেশার জোগান দিয়ে যায় নিজের তাগিদেঁ!

সাম্প্রদায়িক মহামারী হাঙ্গামার দিনেও সে আফিম জোগাড় করেছে, কর্ত্তাকে সে জন্যে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামাতে হয়নি বা নেশার তাগিদে কষ্ট পেতে হয়নি। তাইতো কর্ত্তা নন্দীকে এতো ভালবাসেন আর নন্দীও তাই কর্ত্তা-অন্ত-প্রাণ। চাকরী গেলে তার চাকরী জুটবে, কিন্তু এমন বাদশাহী তরিবাতে নেশার খোরাক জোগান দেবে কে?

শ্যামলীকে দেখে নন্দী একবারে ভেঙে পড়লো। ছেলেবেলায় শ্যামলীর মা মারা যান; সেই থেকে এই আফিমখোর বুড়ো নন্দীই না তাকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করে এসেছে! নিজের মেয়ে না হলে কি হয়, কর্ত্তার চেয়ে শ্যামলীকে সে কিছু কম ভালবাসে না!

শ্যামলী অমনিভাবে বাড়ী থেকে চলে আসার পর কতদিন সে কর্ত্তার সঙ্গে ভাল করে কথা পর্য্যন্ত বলেনি। শ্যামলীর গৃহত্যাগের কথা নিয়ে অমন কতদিন সে কর্ত্তার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করেছে, এবং ভৃত্যের মুখে যে ধরণের কথা শোভা পায় না—রাগে দুঃখে সে সব কথাও তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। শেষে কিন্তু সে নিজের মনে নিজে অনুতপ্ত হয়েছে, কর্ত্তার কাছে গিয়ে চোখের জলে ক্ষমা ভিক্ষাও করে নিয়েছে। স্নেহ বড় বালাই। কর্ত্তাও তার ওপর রাগ করেন নি, নিজেকে যে ক্ষমা করতে পারে না, অন্যকে সে ক্ষমা চাওয়াবার দুঃসাহস কোথা থেকে পাবে! কর্ত্তারও দু'চোখ জলে ভেসে গেছে মনে হ'য়েছে—শুধু শ্যামলীর কাছে নয়, নন্দীর কাছেও তিনি মহা অপরাধী!

শ্যামলীর ওপর নন্দীর দাবী—স্নেহের দাবী, রাধারমণবাবুর চাইতে কোন অংশে কম নয়। একজন পালনকর্ত্তা আর অন্য জন পিতা, পালনকর্ত্তার দাবী বড়—না পিতৃত্বের দাবী বড়!

—তুমি চলে যাওয়ার পর থেকে দিদিমণি—বাবু যেন কেমন এক রকম হ'য়ে গেছেন! প্রথম প্রথম মনে হ'য়েছিল—মাথাটা বুঝি খারাপ হ'য়ে গেল। পরে দেখা গেল—ঠিক তা নয়, সবকিছুই ঠিক আছে, শুধু একান্ত প্রয়োজন ছাড়া কারোর সঙ্গে বড় একটা কথা বলেন না। সব সময়—চুপ-চাপ। মাঝে মাঝে শুধু 'উঃ' 'আঃ' ব'লে দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলেন। কথা শেষ করে নন্দীও একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে।

শ্যামলী খেদ বিজড়িত কণ্ঠে বললে, বাবাকে ডাক্তার দেখালে না কেন, নন্দীদা?

—দেখিয়েছিলাম দিদিমণি! ডাক্তারের মতে—এই সদাই চুপচাপ ভাবটাই এক রকমের পাগলামি। ওষুধে কোন এর কাজ হবে না।

আকুল আর্ত্তকণ্ঠে বললে শ্যামলী, তাহলে কি হবে, নন্দীদা? কেমন করে সারবে?

—সারা—না সারা ভগবানের হাত। তবে ডাক্তারবাবু বললেন, হঠাৎ খুব আনন্দে অথবা দুঃখে—হয় বাবুর মাথা ভাল হ'য়ে যাবে, অথবা—অথবা—বলতে বলতে মাঝপথে গম্ভীর হ'য়ে গেল নন্দী।

—বলতে বলতে থামলে কেন নন্দীদা, বল? আঘাতটা যতই কঠিন হোক না কেন—আমি সহ্য করতে পারবো। তুমি আমার কাছে লুকিও না! আর্ত্তকণ্ঠে বললে শ্যামলী।

—কি আর বলবো, দিদিমণি! হয়তো—হয়তো বাবু মারাও যেতে পারেন!

—ওঃ! অস্ফুট কণ্ঠে ডুকরে উঠলো শ্যামলী।

—বাড়ী চল দিদিমণি! বাবু তোমাকে দেখলে নিশ্চয়ই সেরে উঠবেন।

—না নন্দীদা! বাড়ী আমি আর ফিরবো না।

—সে কি দিদিমণি! বাপের ওপর কি রাগ করতে আছে? বড় হ'য়েছো তুমি, বুঝে দেখো—বাবুর ছেলে বলতেও তুমি আর মেয়ে বলতেও তুমি! বাড়ী না ফেরা কি তোমার ভাল দেখায়! শ্যামলীকে বোঝাতে চেষ্টা পায় নন্দী।

—বাড়ী আমার ফেরা হবে না, নন্দীদা! আমরা একটা নতুন বাসা খুঁজছি। তুমি বরং মাঝে মাঝে সেখানে একটু কষ্ট করে গিয়ে বাবার খবরটা দিয়ে এসো।

ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললে নন্দী, একি একটা কথার মত কথা, দিদিমণি! বাড়ী তোমার ফিরতেই হবে! আর তোমায় রাগ করে দূরে থাকতে দেবো না, দিদিমণি!

—দূরে থাকতে আমারও প্রাণ চায় না, নন্দীদা!

—তবে? ঠিক বুঝতে পারে না নন্দী।

—কেন যে আমি ইচ্ছে করে দূরে থাকতে চাই—তা কি তুমি বুঝতে পাচ্ছো না, নন্দীদা!

নির্ব্বাক বিস্ময়ে নন্দী শ্যামলীর মুখের দিয়ে চেয়ে রইলো।

—আমি এ ক্ষেত্রে বাড়ীতে যেতে পারি না, নন্দীদা। আমার জন্যে বাবার মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে। আবার গিয়ে আমি কি হবো তার মৃত্যুর কারণ? শ্যামলীর চোখদু'টি অশ্রুসজল হ'য়ে উঠলো।

—কি যে বল, দিদিমণি। তোমাকে হারিয়ে যাঁর মাথা খারাপ হলো—তোমাকে ফিরে পেয়ে তিনি যাবেন মারা। শুষ্ক মুখে হাসি এলো নন্দীর।

কোন ওজর আপত্তিই খাটলো না শ্যামলীর। নন্দী ওদের নিয়ে একখানা গাড়ীতে চেপে বসলো। যে শ্যামলীকে রাধারমণবাবু একটা দিনের জন্য চোখের আড়াল করেননি—সেই শ্যামলী আজ এতদিন

পরে চলেছে তার বাবার সঙ্গে দেখা করতে। চোখ তার অশ্রুসজল হ'য়ে উঠলো। কে বলবে—এ তার শোকাশ্রু, না আনন্দাশ্রু।

বাজারের ধার থেকে রাধারমণবাবুর বাড়ী নেহাত কম নয়, বেশ খানিকটা পথ। গাড়ীতে এই পথ অতিক্রম করতে করতে শ্যামলী তার বাবার সম্বন্ধে কত কথাই না জিজ্ঞাসা করলে নন্দীকে।

গাড়ী এসে ওদের বাড়ীর সামনে দাঁড়াল।

জরিফ এতক্ষণ পরে এই প্রথম কথা বললে, আমি কি গাড়ীতেই থাকবো—না আমিও নামবো, শ্যামলী?

—সে কি কথা, জামাইবাবু। গাড়ীতে আপনি একা বসে থাকবেন মানে? আসুন—নেমে আসুন। দেরী করলে এ বেটাদের আবার মিটার বেড়ে যাবে। বলতে বলতে নন্দী জরিফকে হাতে ধরে নামিয়ে নিলে।

নন্দীর মুখে 'জামাইবাবু' কথাটা শুনে তাদের দুজনের মুখে খেলে গেল এক ঝলক চোরাহাসি।

জরিফকে নীচে বসিয়ে শ্যামলী একা গেল নন্দীর সঙ্গে ওপরে তার বাবার সঙ্গে দেখা করতে।

—বাবু। কাকে ধরে এনেছি—দেখুন? দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বললে নন্দী।

রাধারমণবাবু সেদিকে ফিরেও চাইলেন না, চোখ বুজিয়ে ব'সে ব'সে যেমন ঝিমুচ্ছিলেন—তেমনি ঝিমুতে লাগলেন।

নিজের মনের 'কিন্তু' ভাবটা কাটিয়ে শ্যামলী এগিয়ে ডাকলে, বাবা!

—কে? শ্যামলী—আমার শ্যামলী! ফিরে এসেছিস মা—?

বলতে বলতে রাধারমণবাবু ছোট্ট মেয়ের মত শ্যামলীকে সজোরে বুকের ওপর চেপে ধরলেন।

পর মুহূর্ত্তে মহা হৈ চৈ সুরু হ'য়ে গেল। বহুদিন পরে স্তব্ধ নির্ব্বাক

একদিন ফিরে সে আসবেই! আপনি তখন জেদের বশে—একরকম দিদিমণির ওপর রাগ করেই না বিষয় সম্পত্তি সব ঠাকুরের নামে উইল করে ফেললেন!

—করেছি তাতে হ'য়েছে কি! উইল পালটে ফেলতে কতক্ষণ? আমার সম্পত্তি—যখন যাকে খুসী আমি দেবো। তবে হ্যাঁ—ঠাকুরের নামটা যখন একবার জড়িয়ে ফেলেছি, তখন কিছুটা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের নামে দিয়ে যাবো!

—কালই তাহলে উইলটা পালটে ফেলুন।

—নিশ্চয়! সে কথা আর বলতে—? তবে খুব সাবধান, কথাটা যেন ঘুণাক্ষরেও তোর দিদিমণির কানে না যায়! অনেক দিন পরে আজ বড্ড তামাক খেতে ইচ্ছে যাচ্ছে। দে—আমার গড়গড়াটা এনে দে। আর—তোর দিদিমণি কি ক'চ্ছে একবার দেখ তো।

—আমি এক্ষুণি পাঠিয়ে দিচ্ছি। ব'লে নন্দী নীচে নেমে এলো।

জরিফের সঙ্গে শ্যামলী তখন গল্প কচ্ছিল। নন্দী তাকে একাংশে ডেকে নিয়ে বললে, জামাইবাবুর কথাটা হঠাৎ বাবুকে জানিয়ে দরকার নেই। বলা তো যায় না—কি বলতে কি হয়! ধীরে, সুস্থে, মেজাজ বুঝে যে কোন সময় বললেই হবে। বাড়ীর আর সবাইকে আমি বারণ করে দিয়েছি।

—আমার মোটে খেয়ালই ছিল না। খু-ব সাবধান ক'রে দিয়েছো?

—আমার খেয়াল ঠিকই আছে দিদিমণি, ডাক্তারবাবু আমাদের ধন্বন্তরী কিনা! চাপা হাসি হেসে নন্দী তার কাজে চলে গেল।

নীচের ঘরে শ্যামলী নিজে বসে থেকে জরিফকে খাওয়াচ্ছিল। নন্দী এসে বললে, বাবু খাবার জায়গা করতে বললেন, তোমার আর কত দেরী দিদিমণি?

তোমার জামাইবাবুর খাওয়া হ'য়ে এলো। এঁর শোবার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েই আমি ওপরে যাচ্ছি। আমাদের খাবার দিতে বল। বললে শ্যামলী।

—আচ্ছা। বলে নন্দী নিজের কাজে চলে গেল।

খেতে খেতে জরিফ বললে, এমনি ভাবে লুকিয়ে ক'দিন তুমি আমাকে রাখবে, শ্যামলী? তা ছাড়া এ-ধরণের লুকোচুরি তো আমরা মেনে নিতে পারি না।

—কথাটা সত্যি! এই ভাবে আর চিরদিন কাটতে পারে না। বাবার মনটা একটু স্থির হলেই আমরা আত্মপ্রকাশ করবো। এক সমাজের সহানুভূতি থেকে আমরা বঞ্চিত হ'য়েছি বলে যে অন্য সমাজের সহানুভূতি থেকেও আমরা বঞ্চিত হবো—এর কোন মানে নেই।

হাসলে জরিফ, বললে, যে সমাজের কথা তুমি বলছো—সে সমাজ আরও বেশী কড়া আর বেশী গোঁড়া! আমাদের আদর্শ এখানেও কোন সহানুভূতি পাবে ব'লে অন্ততঃ আমার তো মনে হয় না। এ যেন আমাদের সমুদ্রের বেলাভূমির ওপর সৌধ নির্ম্মাণের ব্যর্থ পরিকল্পনা।

—কে? এ সেই জরিফ নয়? বলতে বলতে রাধারমণবাবু জরিফের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

জরিফ হাত গুটিয়ে নিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

—তুমি! তুমি এখানে কেন?

—উনি যে আমার স্বামী। দীপ্তকণ্ঠে বললে শ্যামলী।

—স্বামী। এক বিধর্ম্মীকে হিন্দুর মেয়ে হ'য়ে 'স্বামী' বলতে তোমার লজ্জা হলো না। গর্জ্জে উঠলেন রাধারমণবাবু।

—আমার ওপর কেন যে আপনি বিরূপ তাতো আমি আজও বুঝলাম না। মানুষ বড় হয় তার শিক্ষা, সংস্কৃতি—

—চুপ করো—, বাধা দিলেন রাধারমণবাবু, আমার কাছে ওসব কিছুই বড় নয়। আমার কাছে সব চাইতে বড় আমার ধর্ম্ম।

—কিন্তু ধর্ম্ম মানুষ সৃষ্টি করে না, মানুষ সৃষ্টি করে ধর্ম্ম। ধর্ম্মের চেয়ে মানুষই তো বড়। শুধু পারস্পরিক ভালবাসার জন্যে আমাদের এই মিলন নয়, আমাদের মিলনকে অবলম্বন করে আমরা দু'টি সমাজকে বাঁধতে চাই একই সূত্রে।

—অর্থাৎ হিন্দু আর মুসলমান সমাজের মধ্যে বিবাহের আদান-প্রদান স্থাপন করে তোমরা চাও সাম্প্রদায়িকতা দূর করতে। তোমরা দু'টিতে বদ্ধ পাগল। ও তোমাদের মহৎ উদ্দেশ্য নয়, বিকৃত মস্তিষ্কের খেয়াল। হাঃ হাঃ হাঃ—বলতে বলতে পাগলের অট্টহাসি হেসে উঠলেন রাধারমণবাবু।

শ্যামলী বাবাকে দু'হাতে জড়িয়ে বললে আর্ত্তকণ্ঠে, বাবা! বাবা! তুমি প্রকৃতিস্থ হও!

—কিন্তু আমার মেয়ে হ'য়ে তুই এই কাজ করলি! উঃ এ যে ছিল আমার স্বপ্নের অতীত। বলবার কিছু নেই—তোকে আমার বলবার কিছু নেই। নন্দী—এক গেলাস জল। বলতে বলতে রাধারমণ-বাবুর বাষ্প-রুদ্ধ কণ্ঠ ধরে এলো। চোখ ভোরে গেল জলে। উঃ—বলে তিনি লুটিয়ে পড়লেন মেঝের ওপরে।

—বাবা! বাবা! তুমি আমাদের ভুল বুঝলে! আর্ত্তকণ্ঠে ডুকরে উঠলো শ্যামলী।

জল আর রাধারমণবাবুর পেটে গেল না, গাল বেয়ে বাইরে গড়িয়ে পড়লো।

জরিফ বললে, দুঃখ আর কিছু নয় শ্যামলী, আমিই হলাম তোমার বাবার মৃত্যুর কারণ!

—তুমিও নও—আর আমিও নই। বাবার মৃত্যুর কারণ হ'চ্ছে আমাদের উভয়ের আদর্শ। তুমি ঠিকই বলেছিলে—আমাদের এই উদার হিন্দুসমাজেও আমাদের স্থান নেই। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললে শ্যামলী।

নিষ্প্রাণ হাসি হাসলে জরিফ। বললে, কি হিন্দু, কি মুসলমান—কোন সমাজেই আমাদের স্থান নেই। বাইরেটা দেখেই ওরা বিচার করে রায় দিলে, অন্তরের খোঁজ রাখলে না! কিন্তু এ ভুল এদের ভাঙবে, তবে আজ নয়—সুদূর ভবিষ্যতে। যে আঘাত এরা পেলে—সে আঘাতই যথেষ্ট নয়, তার চেয়েও বড় আঘাত আসছে। সেই কঠোরতম আঘাতই আনবে এদের আত্মচেতনা! কিন্তু সে সুদিন যখন সত্যি-সত্যিই আসবে তখন আমরা আর এখানে থাকবো না। আমাদের প্রয়োজন আপাততঃ ফুরিয়েছে। বিড়ম্বিত আশা অবলম্বন করে আমাদের বেঁচে থাকার বাস্তবিক কোন সার্থকতাই আর আমি খুঁজে পাচ্ছি না! বলতে বলতে জরিফের বুক ঠেলে গভীর দীর্ঘ-নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো।

জরিফের হাতখানা নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে শ্যামলী বললে, আমি তা জানি। নিজের বাবা যাকে ভুল বুঝলে—সমাজ তো তাকে ভুল বুঝবেই। বেঁচে থাকার কোন মোহই আজ আর আমি খুঁজে পাচ্ছি না। শুধু সান্ত্বনা এই যে—আমরা পরস্পর পরস্পরকে নিবিড় ভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছি আর মনে-প্রাণে উপলব্ধি করেছি আমরা আমাদের আদর্শ!

—এটাই আমাদের চরম সান্ত্বনা শ্যামলী আর এটাই আমাদের জীবনের চরম সার্থকতা!

* * * * *

ইসলাম-ধর্ম্মী জরিফকে স্বামীত্বে বরণ করার জন্য শ্যামলীর ওপর

গভীর রাগে, দুঃখে আর ক্ষোভে রাধারমণবাবুর আকস্মিক মৃত্যু হলো। ইনি হিন্দু সমাজের প্রতীক হিসাবে এদের মিলন সমর্থন করতে পারলেন না। প্রকারান্তরে পরিষ্কারভাবে বোঝা গেল সনাতন হিন্দু সমাজের মনোভাব।

কলমা পড়িয়ে শ্যামলীকে বিয়ে না করার জন্য এবং যথাসময়ে লোক-দেখানো নমাজ না পড়ার দরুণ জরিফকে কাফের ব'লে প্রকারান্তরে সমাজচ্যুত করলে মুসলিম সমাজ।

ওদের মিলনে হিন্দু ও মুসলমান সমাজের কোন হিতসাধনই হলো না, লোক চক্ষে ওরা শুধু হলো দু'টি ভ্রষ্টা, ব্যাভিচারী, সমাজদ্রোহী ঘৃণ্য নর ও নারী। ওরা চেয়েছিল সকলকে—কিন্তু ওদের কেউ চাইলে না। উভয় সমাজের দুষ্ট ব্রণ হিসাবে ওরা আজ পরিত্যক্ত, দুষ্ট ব্রণের উচ্ছেদই বাঞ্ছনীয়।

হে বন্ধু দম্পতি!

আমাদের মিলনের মধ্য দিয়ে আমরা চেয়েছিলাম দু'টি জাতির সমগ্র নরনারীর আন্তরিক মিলন—ঐক্য! কিন্তু তা হলো না। ওরা আমাদের বুঝলে না, যদি বুঝে থাকে তো ভুল বুঝলে।

মুসলমান জোর করে কলমা পড়িয়ে হিন্দুর মেয়েকে বিয়ে করলে বা হিন্দু প্রেমের যাদুকরী মন্ত্রে মুসলমানের মেয়েকে জীবন সঙ্গিনী করলে যথার্থ জাতির মিলন হয় না। প্রেমের বাঁধনে একটা জাত যতদিন না আর একটা জাতকে বাঁধতে পারবে ততদিন সব কিছু মিলনই ফাঁকা পটকা বাজির আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই নয়। আন্তরিকতা বিহীন মিলনের নামে এই মানুষ ঠকানো ধাপ্পাবাজিকে প্রশ্রয় দেওয়া মানেই মনুষ্যত্বের অবমাননা করা।

আমাদের, এই মিলিত হিন্দু মুসলমানের, প্রেমের মর্য্যাদা কেউ

দিলে না। বাইরেটা নিয়েই সবাই বিচার করলে, অন্তরের দিকে কেউ বারেকের জন্য তাকিয়ে দেখলে না।

কাজেই কি হিন্দু, কি মুসলমান সর্ব্বজন পরিত্যক্ত হ'য়ে ঘৃণ্য, অবাঞ্ছিত জীবন যাপন করে বেঁচে থাকার কোন সার্থকতাই আমরা খুঁজে পেলাম না।

কিন্তু এমন রূপ-রস-মধু-গন্ধ ভরা ধূলির ধরণী ছেড়ে যেতে কার প্রাণ চায় বল? তবু আমাদের যেতে হবে—নিতে হবে চির বিদায় জাতির বৃহত্তর কল্যাণের জন্যে।

তোমরা হয়তো ভাবছো—এ আমাদের কবি জনোচিত অর্থহীন বাক্যাড়ম্বর অথবা তারুণ্যের প্রলাপ, আর নয় সাময়িক উন্মাদনা।

ভুল—! যে চশমা চোখে থাকলে পৃথিবীটাকে শুধু সবুজ, নয়নানন্দকর বলেই মনে হয়—সে রঙীন চশমা খুলে পড়েছে আমাদের দু'জনের চোখ থেকেই। কারণ আমরা জানি, আমাদের এই মিলনে ভেজাল নেই, এ প্রেম—শুধু প্রেম নয়, এ নিখাদ খাঁটি সোনা।

রক্তসাগরে সাঁতার দিয়ে প্রেমের বর্ত্তিকায় আমরা নূতন করে দেখলাম আমাদের এই সোনার বাংলাকে—চিনলাম আমাদের এই মাটির মাকে।

বাংলা মায়ের দুই শ্যামল ছেলে চিরদিন ছিল হাতে হাতে মিলিয়ে। কোথা থেকে এলো কূটবুদ্ধি সয়তান, দাঁড়াল দুই ভায়ের মাঝে, দিলে বিভেদ করে। ভেদবুদ্ধির যাদুমন্ত্রে আমরা আজও রক্ত-পাগল! আমাদের একজনের হাতে ছুরি—অন্য জনের হাতে খাঁড়া! মাতৃ-রক্ত পারাবারে আমরা কাটছি সাঁতার।

পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য চাই বলিদান। সেই বলিদানের প্রথম অর্ঘ্য আমরা!

পুঞ্জীভূত ক্ষোভ-দুঃখ নিয়ে আমরা বিদায় নিচ্ছি মাত্র একটি জিনিষ

সম্বল করে। আমাদের সেই একমাত্র সম্বল—একমাত্র পাথেয় হ'চ্ছে বুক-ভরা আশা।

মানুষের ওপর বিশ্বাস আমাদের অফুরন্ত। আমাদের সমাধির ওপর দাঁড়িয়ে একদিন এদের ভুল ভাঙবে। এমন একদিন আসবে—সেদিন খুব দূরে নয়—যেদিন ওরাই জনে জনে প্রচার করবে আমাদেরই অন্তরের বাণী। পরপার থেকে আমরা শুনবো সেই মহামিলনের গান!

হে বন্ধু, বিদায়! আদাব—নমস্কার!

ইতি—

জরিফ

শ্যামলী

চিঠিখানা খামে ভর্ত্তি করে ওপরে লেখা হলো—মহিম ও সোফিয়ার শ্রীকরকমলে নবযুগের উপহার!

মহিমের কাছে চিঠিখানা পৌঁছে দেবার জন্য নন্দীর হাতে দেওয়া হলো। কোন এক সুদূর দেশে যাত্রার নাম ক'রে ওরা মাঝ রাতে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লো।

ট্যাক্সি নিয়ে ওরা বালি পোলের মাঝ বরাবর পর্য্যন্ত এসে যখন পৌঁছাল তখন ভোরের আলো সবেমাত্র দেখা দিয়েছে। শেষ রাতের জোছনার সাথে ভোরের আলোর কোলাকুলি মানুষের মন মাদকতায় ভরিয়ে দেয়। কে বলে সংসারে সুখ নেই! শান্তির নীড় এই দুনিয়া, স্বপনপুরী কি এর চেয়েও সুন্দর? স্বেচ্ছায় কে চায় রূপ-রস-মধু-গন্ধ-ভরা এই স্বপনপুরী ছেড়ে যেতে!

ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে ওরা পায়ে হেঁটে চলতে সুরু করলে। জরিফ বললে, আমরাও পারতাম শ্যামলী এখানে সুখের সংসার পেতে শান্তির নীড় স্বপনপুরী প্রতিষ্ঠা করতে! কিন্তু এবার আর তা হলো না। কে চায় আমাদের—? কাদের নিয়ে আমরা উদ্‌ঘাটন করবো

আমাদের স্বপনপুরীর তোরণদ্বার? যজ্ঞের হোতারা যদি বিরূপ হ'য়ে দূরে সরে থাকে তা হ'লে যজ্ঞশালা প্রতিষ্ঠার কোন অর্থই হয় না, শ্যামলী!

—আমি সব কিছুই বুঝি জরিফ, তবু মনে হয় আমি তোমার ভাগ্যাকাশে একটা ধূমকেতু! আমাকে হারিয়ে কারোর কোন ক্ষতি নেই, কিন্তু তুমি! বাঙলার বুক থেকে তোমার মত কোহিনুর খসে পড়া মানেই—

শ্যামলীর গলা হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে চলতে চলতে জরিফ বললে, ভুল কচ্ছো শ্যামলী! তুমি ছাড়া আমি একা তো পূর্ণ নই—ছিলাম না কোনদিন। আমরা দু'জনে দু'জনকে ভাল না বাসলে দু'টি বিভিন্ন জাতকে, দু'টি বিভিন্ন সম্প্রদায়কে ভালবাসতে শিখতাম কেমন করে?

ক্ষণেক নীরবতার পর শ্যামলী বিলীয়মান চাঁদের দিকে চেয়ে গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে, আজ ওরা আমাদের বুঝলো না জরিফ, কিন্তু সুদূর ভবিষ্যতে একদিন ওরা বুঝবে।

শ্যামলীকে বুকের ওপর টেনে নিয়ে জরিফ ওর মুখখানি তুলে ধরে বললে প্রেমার্দ্র কণ্ঠে, সেটাই তো আমাদের একমাত্র সান্ত্বনা, শ্যামলী! পারতাম না কি আমি তোমাকে কলমা পড়িয়ে বিয়ে করে আমার সমাজভুক্ত করে নিতে, কিন্তু কি লাভ? তাতে আমি তোমায় পেতাম, পেতাম আমার সমাজ কিন্তু যাকে পাবার তাকেই পেতাম না। তোমার সমাজ রয়ে যেতো আমাদের নাগালের বাইরে। নাঃ শ্যামলী, তোমায় আমায় দিয়ে হিন্দু-মুসলমানের মিলন-সৌধ বাঁধা এবারের মত অসমাপ্তই রয়ে গেল।

—রাতের শেষে জোছনার আলো আমাদের অপূর্ণ আশার মতই নিভে এলো, জরিফ!

—কিন্তু তাতে কি, শ্যামলী! আমাদের বাসর-শয্যা রচিত হবার আগে মিলন-পূর্ণিমা রাত্রি কখনই শেষ হ'তে দেবো না!

এধার ওধার চেয়ে শ্যামলীর হাত ধরে জরিফ পোলের মাঝ বরাবর উঁচু থামটার ওপর উঠে দাঁড়াল। অস্তমিত চাঁদ ক্ষণেকের জন্য দীপ্ত হ'য়ে উঠলো। একদিকে অস্তমিত চাঁদ অন্যদিকে উদীয়মান তরুণ রবি, দুই আলোয় উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো গঙ্গাবক্ষ—যেখানে পাতা আছে ওদের বাসর-শয্যা।

জরিফ আর শ্যামলীর মুখের ওপর ফুটে উঠলো বিচ্ছেদহীন মিলনের অপরূপ অপূর্ব্ব আনন্দ—!

'দুঁহু কোলে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া'—উভয়ে উভয়কে নিবিড় বাহু বন্ধনে বদ্ধ করলে। চারি চোখের পলকবিহীন শুভদৃষ্টি! বুকে বুক—মুখে মুখ—অন্তর দিয়ে অন্তরকে অনুভব!

উত্তরীয় গলা থেকে নামিয়ে শ্যামলীর সঙ্গে নিজেকে শক্ত করে বেঁধে নিয়ে জরিফ গঙ্গাবক্ষ নির্দ্দেশ করে বললে, ঐ গঙ্গাবক্ষে পাতা আমাদের বাসর-শয্যা! এসো শ্যামলী!

শ্যামলীকে বুকে নিয়ে জরিফ ঢলে পড়লো পোলের ওপর থেকে গঙ্গার ঐ রূপালী জলের বুকে।

আর্ত্ত নিশ্বাসে মিশে গেল পতনের ধ্বনি! গঙ্গাবক্ষে জাগলো ক্ষণেকের আলোড়ন। স্থির, ধীর, চির-গম্ভীর গঙ্গা যেমন চিরদিন বহে চলে, আবার বহে চ[illegible]—ছল্—ছল্—ছলাক্!